প্রথম প্রকাশ
১৯৫৭

মুদ্রাকর
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

সারস্বত-সাধনায় যিনি আমার মূর্তিমান অনুপ্রেরণা, যাঁর পরমায়ু আমার জীবনের পাথেয়, সেই শ্রুতকীর্তি বৈজ্ঞানিক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীকরকমলেষু।

চিরসেবিকা
সতী ঘোষ

কৃতজ্ঞতা নিবেদন

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ (দর্শনে ও সাহিত্যে)" গ্রন্থে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর ঐক্যসূত্রের আভাস পেয়েছিলাম ; সেই আভাস অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে ; তাই গ্রন্থারম্ভে সেই প্রয়াত প্রখ্যাত পণ্ডিত গবেষকের উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সূর্যবংশীর "Abhiras Their History of Culture" গ্রন্থটি থেকে আমি সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করেছি ; অধ্যাপক সূর্যবংশীর বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ আমি গ্রহণ করেছি ; তাই তাঁকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাই।

অন্যান্য যে সব গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, বা উদ্ধৃতি দিয়েছি, যথাযোগ্য স্থানে সেই সব গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট মানচিত্রগুলি Schwartz berg Joseph E সম্পাদিত Historical Atlas of South Asia থেকে নেওয়া হয়েছে। Schwartz berg-এর অসাধারণ পরিশ্রমের সুযোগ আমি গ্রহণ করেছি ; সেজন্য তাঁকে আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থ-রচনায় আমি সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা ক'রে যশস্বী হয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের সমস্ত দিক তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে তিনি আগ্রহী ছিলেন। মাঝে মাঝে এই গ্রন্থের কিছু অংশ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ যাতে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার জন্য অসিতকুমার আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। ডক্টর অসিতকুমারের উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্যই আমার পক্ষে এই গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। আমার এই গ্রন্থ যদি পাঠক সমীপে আদৃত হয়, তবে তার গৌরব সমস্তটাই ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই, তাঁর কাছে চিরঋণী হ'য়ে রৈলাম।

আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি - ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রিডিং রুমে বসে।

শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায় যখন যে বই চেয়েছি, নিজে খুঁজে এনে দিয়েছেন, এই বিশেষ সাহায্যের জন্ত আমি শ্রীশান্তনু মুখার্জির কাছে কৃতজ্ঞ, তাঁকে ধন্তবাদ জানাই।

ন্তাশনাল লাইব্রেরীর গুজরাটী বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীখুশালদাস জাসানী—নরসিংহ মেটার পদগুলির এবং কাথিওয়াড়ী ভাষার লোকসঙ্গীতগুলির প্রতিটি শব্দের অর্থ আমাকে এমন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যার জন্ত ঐগুলির অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমার গ্রন্থের এই বিশেষ সংযোজন শ্রীখুশালদাস জাসানীর সাহায্যের জন্তই হয়েছে, আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা আগ্রহের সঙ্গে আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করে যথাসম্ভব দ্রুত ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কর্মী শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, শ্রীঅশোক এণ্টনী বিশ্বাস—এঁরাও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, শ্রীঅশোক এণ্টনী বিশ্বাস যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেস ঠিক ক'রে ম্যাপ আঁকিয়ে, মলাটের ব্যবস্থা ক'রে বই বেরোতে যাতে দেরী না হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন, আমি শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ও শ্রীঅশোক এণ্টনী বিশ্বাসকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই।

ইম্প্রেশন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীসুধাতোষ বসুর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। সুধাতোষবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু তিনি আমার গ্রন্থকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রেছেন। ইম্প্রেশন প্রেসের কর্মী শ্রীকালিপদ সরকার প্রুফ আনা নেবার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছেন। আমি শ্রীসুধাতোষ বসু এবং শ্রীকালিপদ সরকারকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই।

পাঠকবৃন্দের দিকে চেয়ে রইলাম। বিদগ্ধ সমালোচকের কেউ যদি আমার এই গ্রন্থে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনার ক্ষেত্রে কোনো নূতনত্বের সন্ধান পান, তবে আমার অনেকদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে।

লেখিকা

সূচীপত্র

প্রবেশক

মহাদেশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসম্প্রদায় একটী ঐক্যসূত্রে বিধৃত ; সে ঐক্য সংস্কৃতিগত, এবং সে সংস্কৃতি ধর্মভিত্তিক।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী আলোচনা করলে এর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্ম একদিন ভারতের সর্বপ্রদেশে প্রচারিত হয়েছিল, এবং ভারতের সব প্রদেশে সব ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক পদাবলী রচিত হয়েছিল। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় এই সব পদাবলীরই মূলে আছে সংস্কৃতে লেখা একখানি গ্রন্থ—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

ভাগবত কোথায়, কবে, এবং কে রচনা করেছিলেন, তা সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি ; তবে বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রবল জোয়ার এসেছিল, এ কথা ভারতের সব প্রদেশে প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলেই জানা যায়। এবং এই সঙ্গে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাগবতের প্রভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও করা যায়।

ভাগবতের সর্ব প্রধান বিষয়—রাসপঞ্চাধ্যায়। রাস পঞ্চাধ্যায়ের তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভাগবতকার যেমন দিয়েছেন, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজে সেই ব্যাখ্যা গৃহীত ; কারণ বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গ্রন্থ—শ্রীমদ্‌ভাগবত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ভিত্তির ওপরেই বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তবে যে সব বৈষ্ণব কবি ভাগবতে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে পদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের রচনায় পার্থক্য আছে কবির কবিত্বগুণ এবং মানসিকতা অনুসারে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত রাসপঞ্চাধ্যায় দুটি অংশে বিভক্ত—প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকুল গোপরমণীদের উন্মত্ত অভিসার এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের বাদানুবাদ। এই বাদানুবাদের মধ্যেই বৈষ্ণব ভক্তি ধর্মের আধ্যাত্মিকতার যথার্থ পরিচয় মেলে।

শ্রীকৃষ্ণ কূটতর্কে গোপাঙ্গনাদের জর্জরিত করে তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে বলছেন। সজল নয়নে গোপরমণীরা নিবেদন করছেন তাঁরা আর্যপথ পরিত্যাগ করে গৃহসুখ বিসর্জন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশায় গভীরবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুগ্রহ না করেন, তবে জীবনে তাঁদের প্রয়োজন নেই। বলাবাহুল্য রাসপঞ্চাধ্যায়ের এই অংশে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের বাদানুবাদের মধ্যেই গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রচারিত গোপীভাবের বীজ নিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে॥ ১০ম স্কন্ধঃ, ২৯শ অধ্যায়, ৩২ নং শ্লোকে॥ গোপীদের উক্তি—

> যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
> স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
> অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
> প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

অর্থ—হে প্রভু! ধর্মকে আপনি যে বলিয়াছেন পতি, পুত্র ও সুহৃদবর্গের শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের ধর্ম, তাহা উপদেশকারী ও ঈশ্বররূপী আপনার সেবাতেই সিদ্ধ হউক, যেহেতু আপনি দেহধারীমাত্রেরই প্রিয়তম আত্মা ও বন্ধুস্বরূপ।

(অনুবাদ : শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিই গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকটির স্মৃতি এবং এর মধ্যেই গোপীভাবের পূর্ণতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসপঞ্চাধ্যায়ের এই অংশ অবলম্বনে অপূর্ব পদাবলী রচনা করেছেন।

বিপিনে মিলল গোপ নারী।	হেরি ঐছন রজনি ঘোর
হেরি হসত মুরলি ধারি॥	তেজি তরুণি পতিক কোর
নিরখি বয়ন পুছত বাত	কৈছে পাওলি কানন ওর
প্রেম সিন্ধু গাহনি।	থোর নহত কাহিনি॥
পুছত সবক গমন খেম	গলিত ললিত কবরি বন্ধ
কহত কীয়ে করব প্রেম	কাহে ধাওত যুবতি বৃন্দ
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত	মন্দিরে ফিরে পড়ল দ্বন্দ্ব
কাহে কুটিল চাহনি॥	যৈছন বিপথ বাহিনী॥

কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি ॥
ঐছন বচন কহল যব কান
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণি
অবনত আননে নখে লিখু ধরণি ॥
আকুল অন্তরে গদ গদ কহই ।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই ॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ

তাজলি কুলশীল মুরলিক সানে ।
কিঙ্করিগণ জনু কেশেধরি আনে ।
অব কহ কপটে ধরম যুত বোল
ধার্মিক হরয়ে কুমারি নিচোল
তোহে সোঁপিত জিউ তুয়া রস পাব
তুয়া পদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবতু মেল
শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল ॥
করি পরসাদ তহি করয়ে বিলাস ।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস ॥

গোবিন্দদাসের এই পদগুলির সঙ্গে অসমীয়া শঙ্করদেবের রাসলীলার পদের গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ।

শঙ্করদেব (কীর্তন ঘোষা, ২য় কীর্তন)

ঘোষা ভবহারী হরি তারহ মুকুন্দ মুরারি ।
জনম মরণ ক্লেশ সহিতে না পারি ॥
সেবে যেবে সমীপ পাইলেক গোপনারী ।
তা সম্বাক ব্যক্য মোহি বুলিলা মুরারি ॥
কুশলে কি আইলা কৈয়ো ব্রজের কল্যাণ
প্রিয় কর্ম্ম করো কিবা কহিয়ো নিদান ॥
ঘুর্ঘোর রজনী প্রেত পিশাচর গতি ।
ঐ তন থাকিবা তোমা সব স্ত্রী মতি ॥
তোমা সাক না দেখিয়া পিতৃমাতৃচয় ।
তা সম্বার মনে মহা মিলিব সংশয় ॥
দেখিলাহা ইটো বিকশিত বৃন্দাবন ।
শশাঙ্কে ধবল নব পল্লবে শোভন ॥
উলটি ব্রজক যাহা কান্দে শিশুগণ ।
তা সম্বাক প্রতিপালি পিয়ায়োক স্তন ॥

উপপতি নারে ক্রীড়া পরিহিত কর্ম ।
স্বামী শুশ্রূষা কুলস্ত্রীর মহাধর্ম ॥
যদি বা আমাক স্নেহে আইলা গোপীগণ ।
মোক আবে দেখিলা সিজিল প্রয়োজন ॥
বিদূরত থাকি করে শ্রবণ কীর্তন ।
বাঢ়ে মোত ভকতি নির্মল হবে মন ॥
দেখন্তে শুনন্তে সদা হেলা হোকেমতি ।
জানিয়া গৃহতে থাকি করিয়ো ভকতি ॥
কৃষ্ণেরও বিপ্রিয় বাণী শুনি গোপীগণ ।
পাইলন্ত দুরন্ত চিন্তা বিবর্ণ বদন ॥
ওলমাইল মুখ আতি পায়া দুঃখভার ।
সঘনে নিশ্বাস কাঢ়ে শুখাইল অধর ॥
কুচর কুঙ্কুম মানে লোতকে লেপিল ।
থাকিল নিচুকি মুখে বচন হরিল ॥
চরণে ভূমিক লেখে দেখে তামাময় ।
বোলা হরি হরি হোক পাপের প্রলয় ॥

কীর্তন ঘোষা
ওয় কীর্তন

গোপাল কৃষ্ণকরহ ত্রাণ ।
তোমাক না দেখি ন সহে প্রাণ ॥
শোকুক তন্তায়া গোপী সকলে ।
জলচিলা মুখ আখি আকলে ॥
গদগদ মাত মুখে নোহলাই ।
বুলিতে লাগিলা কৃষ্ণকে চাই ॥
ভকত বৎসল তোমাকে জানি ।
কেনে বোলা হেন দাতুক বাণী ॥
সমস্ত বিষয় এড়িয়া স্বামী ।
ভজিবে তোমার চরণে আমি ॥
ভজিয়ো আমাক বিলেক ভাগ ।
মকরা নাথ ভকতক ত্যাগ ॥

কহিলা যিটো কুলস্ত্রীর কর্ম।
তোমাতে থাকোক সিদব ধর্ম॥
জগতরে বন্ধু আত্মা তুমি।
সমস্ত ধর্মর আপনি তুমি॥
তুমি আত্মা হেন জানি সম্প্রতি।
তোমাত সে করে ভকত রতি॥
না লাগে পতিপুত্র দুঃখ হেতু।
হয়োক প্রসন্ন গরুড় কেতু॥
করিছে আশা যিটো চির কাল।
ন করিয়ো তাক ভঙ্গ গোপাল॥

দ্বাদশ শতকে রাধা অবলম্বনে পূর্ণ বিকশিত কাব্য জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল শ্রীমদ্‌ভাগবত। রাধাকৃষ্ণলীলার আদি কবি

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তথা জয়দেব সরস্বতীম্।"

বলে কাব্যারম্ভ করেছেন বটে, তবে তাঁর কাব্যে "হরিস্মরণে সরসং মনো" অপেক্ষা 'বিলাসকলাসু কুতূহলমের' দিকটাই স্থানে স্থানে বড় হয়ে উঠেছে মনে হয়। জয়দেব ভাগবতের রাসলীলারবর্ণনা অবলম্বনে পদ রচনা করেছিলেন; কিন্তু সে বর্ণনা সম্পূর্ণ ই তার নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত।

ভাগবতে বর্ণিত রাস শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জয়দেব বর্ণনা করেছেন বাসন্তরাস। ভাগবতে বর্ণিত রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অংশে গোপীদের উন্মত্ত অভিসার এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের বাদানুবাদ জয়দেবের কাব্যে স্থান পায় নাই। ভাগবতে রাসনৃত্যের বর্ণনায় যেখানে শৃঙ্গাররসের বিস্তৃত প্রকাশ, সেইখানে জয়দেবের সঙ্গে মিল দেখা যায়।

ভাগবতে রাস নৃত্যের বর্ণনা আছে—

বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরু নীবীস্তনালভননর্ম নখাগ্রপাতৈঃ
ক্ষ্বেল্যাবলোক হসিতৈর্ব্রজ সুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার॥

অর্থ—বাহু প্রসারণে, আলিঙ্গনে এবং হস্ত গণ্ড স্থলে বিলম্বিত কেশগুচ্ছ, উরু, কটির বস্ত্র গ্রন্থি ও স্তনদেশ স্পর্শদ্বারা এবং নখাগ্রপাতে কটাক্ষনিক্ষেপ হাস্য

পরিহাস ও ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ সুন্দরীগণের কামভাব উদ্দীপ্ত করিয়া ক্রীড়া করাইলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক)

অনুবাদ—শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী

কবি জয়দেব রাসনৃত্য বর্ণনা করেছেন—*

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি
পশ্যতি সস্মিত চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্।

অর্থাৎ কৃষ্ণ কোন গোপীকে চুম্বন, কোন রামার রতিবর্ধন করিতেছেন, তিনি সহাস্য বদনে কাহারও প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া অনুরাগের সহিত অপর গোপীর অনুসরণ করিতেছেন। ॥ গীতগোবিন্দম্ প্রথম সর্গ শ্লোক ৪৬ ॥

(অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী বিদ্যাভূষণ)

গীতগোবিন্দে লৌকিক রসের বিস্তৃতি জয়দেবকে কবিখ্যাতির শীর্ষদেশে স্থাপন করেছিল এবং গীতগোবিন্দের প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গুজরাটের ভক্ত বৈষ্ণবকবি নরসিংহ মেটা জয়দেবের অনুসরণে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করেছিলেন।

কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর Gujrat and its literature from early times to / 1852".

গ্রন্থে নরসিংহ মেটার রাসসহস্রপাদী সম্বন্ধে লিখেছেন "It is a free and elaborate rendering of the Rasa as described in the Bhagvata with possible borrowings from the Brahma vaivarta His chaturis are again inspired by the Gitagovinda.

রাস সহস্রপদী ॥ নরসিংহ মেটা ॥

পদ সংখ্যা ২১৪

আজ রঙিয়া রমণী রমত রসভরি
বণিতা বৃন্দমা নাথ মহালে।
অবলানে উর ধরে অধর চুম্বন করে,
সান করে নেন চালে ॥

অনুবাদ ॥ লেখিকা

রভস ক্রীড়ায় আজি মধুময় রাতে
বৃন্দাবনে মাতে গোপী নাথের সাথে ॥
অবলাকে বুকে ধরি অধর চুম্বন করে
ইশারা করে বাঁকা নয়ন ঠারে ॥

২১৫

ধক্ক আধক্ক আধক্ক রহত রলে
রঙ্গ ভৈরো নাথ বলঘাত ভিড়ে
অবলা আনন্দ হু অধর চুম্বন করে
অলবেহু অঙ্গনা অঙ্গ মোড়ে ॥
ভনে নরসিংহ হোঁ কোন
বর্ণন করু এ তনী এ ষ শোভা

অনুবাদ ॥ লেখিকা

ধক্ক ধক্ক ক্রীড়া করে রঙ্গভরে নাথ
বলে ধরি অঙ্গনারে করে আলিঙ্গন
মহা সুখে অঙ্গ মোড়ি নাথের অধরে
চুম্বন আঁকিছে গোপী ফিরায়ে বয়ান ॥
ভণে নরসিংহ আমি কোন্ ছার
বর্ণিতে পারি হায় শোভা সে তেমন ॥

২১৬

নাচ্‌তা নাচ্‌তা নেনে নানা মোড়িয়া
মদভরা নাথনে বাত ভরতা
ঝমকতে ঝাঁঝরে তালি দে তরুণী,
কামিনী কৃষ্ণসু কেল করতা ॥

অনুবাদ ॥ লেখিকা

নাচিতে নাচিতে মিলিল নয়ন।
মদ ভরে নাথ করে আলিঙ্গন ॥
বাজিছে নূপুর-তরুণী দেই তালি
কামিনী কৃষ্ণ সাথে করিছে কেলি ॥

২২০

রসমাহে জলতা কৃষ্ণ কামা সঙ্গে
রজনী রেল মা অঙ্গ অপি
ভুজবল ভীড়তা অধর অমৃত করি
সর্বস নাথ নে রহিয়ে সোঁপি ॥
ভণে নরসিংহ প্রেম না সুখ মা
কাহানো নে কামুনী মন ভাবি।

অনুবাদ ॥ লেখিকা

রসমাঝে মগ্ন কৃষ্ণ কামিনীর সাথে
ঝলসিছে সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমেতে উদ্বেল
দৃঢ় বাহুপাশে বাঁধি করে আলিঙ্গন
চুম্বিয়া সঘনে করে অধরামৃত পান
জীবন সর্বস্ব গোপী সঁপিয়াছে নাথে।
ভণে নরসিংহ কাহ্ন প্রেমিকামুখ মাঝে
সকল কামিনী মন করিছে হরণ॥

২৩৩

আনন্দে আলিঙ্গন আপি ওহাল
ওহালে উরপর লি ধোরে।
ওয়াড়ি বিহার করে বনিতাসু
সকল মনোরথ সিদ্ধ রে॥
ভণে নরসিংহ সুর নর মোহিত
দেব দুন্দুভি বাজায় রে।

অনুবাদ॥ লেখিকা

প্রেমভরে কৃষ্ণ করে আলিঙ্গন
আনন্দেতে ধরি উর পরে।
যোড়িয়া অঙ্গ বিহরে অঙ্গনা
সকল মনোরথ সিদ্ধ রে॥
ভণে নরসিংহ সুরনর মোহিত
দেবদুন্দুভি বাজায় বে॥

পদ—

থেই থেই করে অগণিত অঙ্গনা
গোপী গোপী প্রত্যে সোহে কান,
ঝাঁঝর নেপুর কটি ত্ংমী কীংকিনী
তাল মৃদঙ্গ বন একতান॥
নাচতা নাচতা খেল খেল্যে ভয়ো
সপ্ত স্বর ধ্বনতে গগন চালী,
লচ্‌কে লচ্‌কে করে নাথনে উর ধরে
পরস্পর বাংহেডী কন্ঠ ঘালী॥

অনুবাদ। লেখিকা

থেই থেই করে অগণিত অঙ্গনা
প্রতি গোপী সাথে শোভে সুন্দর কান
বাজিছে নুপূর কটিতটে কিংকিনী
তাল মৃদঙ্গ রস একতান ॥
নৃত্যের তালে তালে সপ্ত সুরের ধ্বনি
উথলি উঠিছে ভরি সকল গগন ॥
আলিঙ্গন করে গোপী নাথে হৃদে ধরি
একে অপরের গ্রীবা ভুজপাশে ধরি ॥

গীতগোবিন্দে শ্রীরাধার মানভঞ্জনে লৌকিক রসের বিস্তৃতি জয়দেবের অসাধারণ কবিত্বগুণে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যার জন্য গীতগোবিন্দের প্রভাব সমগ্র ভারতে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল।

শ্রীরাধার মানভঞ্জন বর্ণনায় জয়দেবের কবি কল্পনার অভিনবত্বের মূলে একটা বাস্তব কারণেরও অনুসন্ধান করা যায়। জনশ্রুতি আছে জয়দেব-কান্তা দেবদাসী পদ্মাবতী গোবিন্দ মন্দিরে নৃত্য করতেন এবং জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন। তালভঙ্গে পদ্মাবতীর নৃত্য স্খলিত না হয়, তার জন্য জয়দেবকে পদ্মাবতীর চরণ দুখানির উপরেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হ'ত মৃদঙ্গ বাজাবার সময়ে। পদ্মাবতীর সেই অনুপম চরণ দুটির স্মৃতি "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তী কবি জয়দেবের কল্পনার খোরাক যুগিয়েছিল, এই ধারণা অযৌক্তিক নয়।

ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নেই, এবং তাঁর মানভঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনাও নেই। তবে ভগবান যে ভক্তের প্রেমের অধীন, ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে নিজমুখে সে কথা স্বীকার করিয়েছেন। বিরহের জ্বালার মধ্যে কামহীন শুদ্ধ নির্মল প্রেমের গভীরতা ও তীব্রতা গোপীদের প্রাণে সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ রাস-স্থলী থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ভাগবতের ছত্রে ছত্রে গোপীদের বিরহ বিলাপ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা এমন মর্মস্পর্শী, যে ভাগবতকারের এই বাণী—বিরহেই প্রেমের সর্বাধিক স্ফূর্তি, স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩২শ অধ্যায় শ্লোক ২১, ২২শে

শ্লোক ২১

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়ে বলাঃ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মা সূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

অর্থ—

হে অবলাগন—আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বেদধর্ম ও স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত তিরোহিত হইয়াছিলাম। অথচ আমি পরোক্ষ থাকিয়া তোমাদেরই ভজনা করিতেছিলাম। অতএব হে প্রিয়গণ। তোমাদের প্রিয় এই আমার প্রতি তোমরা দোষ দৃষ্টি করিতে পার না।

(অনুবাদ—শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী)

শ্লোক ২২

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মা ভজন্ দুর্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা

অনুবাদ॥

আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নির্মল, এবং তোমরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে যে ভজনা করিয়াছ, আমি সুদীর্ঘকাল আয়ুতেও সেই প্রত্যুপকার সাধন করিতে পারিব না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তাহার পরিশোধ হউক।

(অনুবাদ—শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী)

বিরহের নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ গোপী হৃদয়ের ক্রোধ ও অভিমান দূর করবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যে অনুনয় চাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে, তারই অনুপ্রেরণায় কবি জয়দেব শ্রীমতীর মানভঞ্জের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের জন্য কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত, রাসস্থলী থেকে প্রধানা গোপীকে নিয়ে অন্তর্ধান কালে তার পথশ্রম লাঘবের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে কাঁধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন, ভাগবতকারের কল্পনা এই পর্যন্ত।

পদ্মাবতী চরণচারণ-চক্রবর্তী কবি জয়দেবের কবি-কল্পনা আরো অনেকদূর বিস্তৃত। শ্রীরাধার মানভঞ্জের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পায়ের উপর মাথা লুটিয়ে দিয়েছেন। এই কল্পনায় গীতগোবিন্দের পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ হয়।

গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের মুখে "দেহিপদপল্লবমুদারম্" উক্তিতে ভক্ত প্রেমাধীন ভগবানের অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চমৎকৃত ও অভিভূত

হয়ে পড়েছিলেন। মহাপ্রভু দিনরাত্রি গীতগোবিন্দ গান করতেন এবং শ্রবণ করতেন বলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিকুল জয়দেবকে তাঁদের আদি কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং গোস্বামী আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

গীত গোবিন্দে অপরূপা লাবণ্যময়ী শ্রীরাধার বিষাদ মলিন অশ্রুভরাক্রান্ত মুখচ্ছবি এবং সেই অপরূপার রাতুল চরণ দুখানির উপর নত শির শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অতি মনোহর। চূড়ায় বাঁধা শিখিপুচ্ছ হেলে পড়েছে, সাধের বাঁশি ধূলায় লুটাচ্ছে, বাঁশির সুরে সাড়া মিলবে না রাধার, তাই বাঁশি ফেলে দিয়ে করযোড়ে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ—অশ্রুধারায় বিগলিত পীতধটী, এই অভিনব চিত্রখানি ভারতবর্ষের সব প্রদেশের শিল্পী মনেরই কল্পনার খোরাক যুগিয়েছিল।

জয়দেবের বহু পূর্বে নবম শতাব্দীতে রচিত দাক্ষিণাত্যের আড়বার সম্প্রদায়ের শঠকোপের তিরুবায়মোড়ী তে মানের পদ পাওয়া যায়।

ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের ॥ ১০ ম স্কন্ধ ৩২শ অধ্যায় ৬ নং শ্লোকে ॥ বর্ণনা আছে— একাভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভ বিহ্বলা।

ঘ্নতীবৈক্ষ্য কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা।

অর্থাৎ প্রণয়কোপ বিহ্বলা একজন গোপী ভ্রুকুটি করিয়া ও ওষ্ঠাধর দংশন পূর্বক কটাক্ষপাতের দ্বারা কৃষ্ণকে যেন তাড়না করিতে লাগিলেন। শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁহার ফেলালব শীর্ষক ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন—

কিয়ৎ দূরে দেখা গেল প্রণয় কোপাবেশে বিহ্বলা হইয়া কোন গোপিকা শুভ্র দন্ত পংক্তিদ্বারা বিম্বাধর দংশন করিতে করিতে অপূর্ব ভ্রুভঙ্গি প্রকাশ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিতেছেন। দৃষ্টিপাতের মধ্যে তীব্র অভিমান ও মানহেতু ইষ্টজনের প্রতি অনাদর প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি নিকটে গেলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আমার তিনিই আসিবেন আমার নিকট। আবার প্রতিপক্ষাদের নিকটবর্তী দেখা যাইতেছে। সেইজন্য ভৎর্সনাপূর্ণ রোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ। এই নায়িকা প্রখরা সুমধ্যা, অত্যন্ত স্বাধীনকান্তা ও বামা। অতএব ইনি শ্রীকৃষ্ণকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধাই হইবেন।

এই শ্লোকটার অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ভাষায় বহু মানের পদ রচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দু চারটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

তিরুবায়মোড়ি—ষষ্ঠ শতক, দ্বিতীয় দশক

ষষ্ঠ গাথা। রাগ—কল্যাণবড়াড়ী, তাল—আদি।

সুভকি এবল কুভব পন্কোড়ু কোরিয়্বৈ
　　মৈরছ কণব মোন রিবৈ
পড়কি য়াথিরুপ্ পোবরব
মে ? য়িং তিক বরুল্কন্
　　অড়কি য়ারিব বুনক মুনরুকহুয়নেবি
মৈছুকু বার পলকলয়
　　কড়ক মেরেল নখী !
উকন কৃমিনৈ দেকন্‌য়মে ॥

অনুবাদ । যতীন্দ্র রামানুজদাস

মোরে বাক্যে তুষ্ট করি　　ক্রীড়া পুত্তলিকা হরি
　　কিবা ফলোদয় জানি তোমা বারে বার ।
তব এত কৃপা ভারে　　না পারি যে সহিবারে
　　অনুচিত আচরণ কর পরিহার
রূপে গুণে অনুপমা　　আছে বহু প্রিয়তমা
　　মহিষী তোমার যোগ্য সেথা যাও চলি
আমরা অযোগ্য আর　　তুমি পূর্ণ গুণাধার
　　এ সভায় পশিওনা সার কথা বলি

এর সঙ্গে তুলনীয় বাংলা বৈষ্ণব পদ ।

শ্রীশ্রীপদ্ কল্পতরু
পদ সংখ্যা ৯।৪।২৮

মাধব । কাহে কান্দয়সি হামে
চলি যাহ সো ধনী ঠামে
তাকর চরণ যাই সেবি
সো যাবক তুয়া অঙ্গ ।
　　ততহি করই পুন রঙ্গ
সোই পরব তুয়া কাম
　　কি ফল মুগুধিনী ঠাম
এত কহি গদ গদ ভাব
　　ভণ রাধামোহন দাস ॥

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় নরসিংহ মেটার পদ

সাঁচু বোলো শ্যামলিয়া ওহালা
কাঁহা ক্যম গয়া তার রে
মানী তীনে ভবন ত্যজিনে
কোনে মহোল রহয়া তার রে ॥
আজ রজনী রড়তা বীতি
কন্থ বিনা ক্যম রহিয়ে রে ॥
হমণা হেত উতারক হরজী
পেলী নওল নারস্থ মন মোহিউরে
তমো বিনা অম্মো ঝলসি মরিয়ে
তোল তমারু ঝেহিউরে ॥

অনুবাদ ॥ লেখিকা

সত্য বল শ্যামল প্রিয়
কোথায় তুমি গিয়েছিলে
ত্যাগ করে এই প্রিয়ের ভবন
কার মহলে রয়েছিলে
কাটল নিশি চোখের জলে
কান্ত বিনা রহি কেমনে রে—
ছট্‌ফটি হায় রজনী গোঙাই
এমন হলে সহি কেমন করে
পড়ল ভাঁটা প্রেমে আমার
মন পেল ঐ নতুন মেয়ে
আমরা ঝুরি তোমার লাগি
তোমার চরিত বুঝনু এবার ॥

প্রখ্যাত পণ্ডিত গবেষক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে জয়দেব থেকে সুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে—বিশেষ করে বাংলাদেশে রাধাপ্রেমকে অবলম্বন করে যে প্রেম কবিতা গড়ে উঠেছে, তার কাঠামোটি পূর্ববর্তী প্রেম কবিতার মধ্য থেকেই গৃহীত হয়েছে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সর্বভারতীয় বৈষ্ণব কবিতার যে মূল্যবান সমালোচনা

করেছেন তাই এই সমালোচনার শেষ কথা। ডক্টর দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রম বিকাশ বর্ণনে ও সাহিত্যে গ্রন্থে বলেছেন—

"রাধিকার বয়ঃসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণীর প্রেম চাঞ্চল্য, প্রেমের নিবিড়তা ও গভীরতা, মিলনবিরহ, মান অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ণনা আমরা বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে পাই, পার্থিব নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় প্রেমের বর্ণনা—এমন কি সেই প্রেমের বর্ণনার কলাকৌশল পর্যন্ত প্রায় সবই আমরা পূর্ববর্তী কাব্য কবিতার ভিতরে পাই। তবে পূর্ববর্তীরা সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেকস্থানে স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবিগণ বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতরে সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিরহ অবলম্বনে প্রেমের এই যে সূক্ষ্ম এবং গভীর সুর, তাহাই রাধাপ্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে দেখিতে পাই—পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণিত প্রেম হইতে রাধা প্রেমের যে পার্থক্য, তাহা দুটি কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ একটী তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটী হইল বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে—প্রাকৃত মর্তভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যাত্রা।"

ডক্টর শশিভূষণ তাঁর চারশ পাতার অপূর্ব গ্রন্থে যে সমস্ত গবেষণালব্ধ প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, সে সব প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তবে অল্প কিছু উদাহরণের সাহায্যেই তাঁর সমালোচনার যাথার্থ্য নির্ণয় করা যেতে পারে।

সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস শ্রীমদ্‌ভাগবত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায় দর্শনের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট অংশ এবং গোপীদের বিরহ বিলাপ—রাসপঞ্চাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদের উন্মত্ত অভিসার ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের বাদানুবাদের মধ্যে গোপীভাবের—যে বীজাঙ্কুর লক্ষ্য করা যায় গোপীদের বিরহ বিলাপের মধ্যে সেই অঙ্কুর পূর্ণ বিকশিত। বস্তুতঃ পক্ষে ভাগবতে গোপরমণীদের বিরহ বিলাপের মধ্যে দর্শন ও কবিত্বের যে অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে তাতে প্রকৃত ভক্ত এবং সাধক কবিমাত্রেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশের সব প্রধান ভাষার বৈষ্ণব কবিতাতেই বিরহের পদ পাওয়া যায় সে সব কবিতাতেই অনুভূতির অতল গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতার

স্পর্শও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

তামিল মূল ॥ তিরুবাও মোড়ি—সপ্তম শতক, দ্বিতীয়দশক, চতুর্থ গাথা। রাগ নীলাম্বুরী তাল আদি।

ইট্টকা লিট্ট কৈয়লা স্থিরুক্ক্‌ত্তু
মেত্তুন্দুলায় ময়ত্তুঁ কৈ কুম্পুম্‌
কট্টমে কাদ লেনক্মূচ্‌ চিক্কুও
লওবল্ল। কড়িয়ৈকা লেন্নুম্‌
বট্টবা নেমি বলদৈয়া য়েন্নুম্‌
বন্দিওা যেন্‌রেন্‌রে ময়ঙ্গুম
সিট্টনে! সেত্তুনারৎ তিরুবরঙ্গ গত্তায়।
ইবল্‌ তিরত্তেন সিন্দিৎ তায়ে

অনুবাদ আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস

না চলে চরণ কর বিরহেতে জরজর
উঠিয়া চলিতে যায় পড়ে মূরছিয়া।
কৃতাঞ্জলি পুটে কয় প্রেমে এত দুঃখ হায়
সাগর বরণ তব নিরদয় হিয়া॥
কোথা চক্রপাণি সম এসো এসো প্রিয়তম
এতবলি মূরছিয়া হারায় চেতনা
শ্রীরঙ্গ নিবাসী পতি মোর এ দুহিতা প্রতি
কিবা প্রতিকার তুমি করিছ ভাবনা

এই পদের সঙ্গে তুলনীয় বাংলা পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু পদসংখ্যা-১৯২৮

শকতি খীন অতি উঠই না পারই
কাতরে সখিমুখ চাই।
পরশি ললাট করে মুখ ঝাপল
পতুমিনি হিমকর খাই॥
মাধব! করুণা কি লব তোহে নাই
একবেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥

রাই উপেখি ধরণি পর লুঠই কত কত সায়ক নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় জানি॥
এতদিনে নবমি দশা পরিপূরল শ্বাস ব হুই উধ মন্দ।
মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত॥

হিন্দী কবি॥ সুরদাস

আজু বরখত নয়না হামারি
সদা রহত বরখা ঋত হাম পর
যব সে কৃষ্ণ সিধারে॥
নিশিদিন বরখত নয়না হামারি।
অঞ্জন দেত রহত নাহি কবহুঁ
কারে কপোল ভয়ো কারে
সুরদাস প্রভু সো যা কহিও
গোকুল ক্যায় সে বিসারে॥

অনুবাদ॥ লেখিকা

আজি নেমেছে বাদল আঁখিতে আমার
ঝরিছে কেবল নয়ন রে।
বিরাজে বরষা ঋতু সদা আমা পরে
গেছে চলি যবে হতে কৃষ্ণ রে॥
অঞ্জন দিই যদি রহে না তো কভু
শুধুই কালিমা ভরে কপোলে কালো
সুরদাস প্রভু যাও নাগো বল
কেমনে রয়েছে সে ভুলে গোকুলেরে॥

গুজরাটী কবি॥ মীরাবাঈ

চিতনন্দন বিলমায়ি
বাদরণে ঘেরিও মাঈ॥
ইতঘন গরজে উতঘন লরজে
চকমত বিজু সবায়ি
উমড ঘুমড চহুঁ দিশসে আয়ো
পবন চলে পুরবাই
বাদরণে ঘেরি ও মাঈ॥

বিরহণে মেরো প্রাণ জলত হায়
দগধ বেলী সিঁচাই
প্রাণ রাখত মোকো দরশন দিযো
প্রাণ রাখু চরণাই ॥
দাতুর মওর পাপিহা বোলে
কোয়েল শব্দ শুনাই
মীরাদাসী চরণ উপাসী
চরণ কমল চিত লাই ॥

অনুবাদ ॥ লেখিকা

বিলম্ব কেন চিতনন্দন মোর।
বাদলের মেঘে ঘিরেছে গগন,
হেথায় হোথায় গরজে সঘন,
চমকিছে হায় দামিনী ঘোর ॥
দশদিকে হায় আজি ঘটা ঘন
ধায় অতি দ্রুত পূরব পবন
ঘন মেঘ নামে গগন পর ॥

বিরহ-অনলে জলিছে পরাণ
দগ্ধ লতায় কর বারি সিঞ্চন
প্রাণ রাখিবারে মোরে দিও দরশন
চরণকমলে রাঙা রাখিব পরাণ ॥

দাদুর ময়ূর পাপিয়া কুহরে
কোকিল কূজিছে পঞ্চম স্বরে
মীরা দাসী তব চরণ উপাসী
ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদে চরণের তরে ॥

অসমীয়া ॥ শঙ্করদেব

মাধব! বিরহে হরয় চেতন
তনু জীবন না রহে
চন্দ চন্দন মলয় সমীরে
কেশব বিনে বিষ বরিষে শরীরে ॥

ঘন ঘন হায় মদন পঞ্চবান
কোকিল কুহু কুহু মোরি প্রাণ
পড়য় পাত অচিত হিমবারি
মধুকর নিকর করয় মহামারি ॥
আচিন সময়ে মধুপুরী পিউপ্রাণ
কৃষ্ণ কিঙ্কর রস শঙ্কর ভাণ ॥

বাঙলাদেশে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর অভিনবত্ব ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত এক কথায় ব্যাখ্যা করেছেন—"বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে প্রাকৃত মর্তভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামে যাত্রা।"

(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৮)

এর কারণ চৈতন্য পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কবিদের চোখের সামনে যাঁর শ্রীমূর্তি ছিল তিনি "রাধা ভাবত্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ" রাধার প্রেম হৃদয়ে উপলব্ধি করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন ; তখন হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে মাটিতে গড়াগড়ি দেবেন, তাঁর কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবে এই জেনে রাধা স্বীয় অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ আবৃত করে তাঁকে ভাবরূপা রাধায় পরিণত করে দিলেন, এই জন্যই শ্রীচৈতন্যের রূপ রাধাভাবত্যুতি সুবলিত এবং এই জন্যই তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহিরাধা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
(চৈ চ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ ॥)

রাধাভাবত্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন ভগবদ্বিরহের জীবন্ত প্রতীক। তরুণ বয়সে প্রিয়া বিচ্ছেদের মর্মান্তিক বেদনা এমন ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন অধিকার করেছিল, যে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের শেষে গৃহে ফিরেই সর্পাঘাতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে নৌকা ফেরাতে বলেছিলেন, এই রকম জনশ্রুতি আছে। গৃহে ফেরার আকর্ষণ তাঁর দূর হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় এই আঘাতেই বিরহকে অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যের প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত মানসিক যাত্রারম্ভ এবং সাধক জীবনে এরই পূর্ণতম বিকাশ।

শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল রূপটির পরিচয় শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী

কবিদের কাব্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। বিশেষ নর নরহরি সরকারের পদে।

পদ নরহরি সরকার—

১। গৌর সুন্দর মোর
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে
সকলি অকাজ করে মনসিজা

২। আরে আমার গৌর কিশোর
ক্ষণে উচ্চৈস্বরে গায়
কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণ নাথ
ক্ষণে আঁখিযুগ মুন্দে
হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥

৩। গম্ভীরা ভিতরে গোরা রহিয়
জাগিয়া রজনী পোহায় ॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত—খেনে খেনে কাঁপ।
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণ নাথ ॥

শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের যে ভাবাবেশ বর্ণিত হয়েছে, পদাবলীর রাধার নানা মূর্তির উপজীব্য এই বর্ণনায় বর্ণিত গৌরচন্দ্রিকার পদে শ্রীচৈতন্যের মূর্তির সঙ্গে পদাবলীর রাধামূর্তি এক এক জায়গায় একেবারে মিলে যায়। তুলনায় বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

গৌর চন্দ্রিকা নরহরি সরকার।
সোনার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর
পাণ্ডুর ভৈগেল দেহ।

শীতে ভীত যেন কাঁপয়ে সঘন

লোঙরি পুরব লেহ ॥

কিছুনা কহই দীঘ নিশ্বাসই

চিত্রের পুতলি পারা

নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল

যেন মন্দাকিনী পারা।

ঘামে তিতি গেল সব কলেবর

না জানি কেমন তাপে

কখন সঙ্গীত কখন রোদন

কিবা করে পরলাপে ॥

কহে নরহরি মোর গৌরহরি

চাহয়ে রঙ্কের পারা

হরি হরি বোলে ভুজযুগ তোলে

মরম বুঝিবে কারা।

এই পদের সঙ্গে তুলনীয় চণ্ডীদাসের পদ—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে

না চলে নয়ান তারা

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে

যেমতি যোগিনী পারা ॥

শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ব্যাখ্যার থেকেই বোঝা যায় যে চৈতন্যযুগেই শ্রীরাধিকার অধ্যাত্ম মূর্তির মহিমাময় পূর্ণ প্রকাশ।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকার পদে বর্ণিত চৈতন্যের ভাবাবেশ এবং পদাবলীতে বর্ণিত রাধার নানা অবস্থার মধ্যে যে মিল পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত রাধার প্রাকৃত মূর্তির চারিপাশে তাঁর অধ্যাত্ম মূর্তির একটা অশরীরী ছায়া মাঝে মাঝে একটি দিব্য পরিমণ্ডলের আভাস রচনা করেছে, এই জন্যই চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে লৌকিক রসের যথেষ্ট পরিমাণ প্রাধান্য সত্ত্বেও

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত যথার্থ মন্তব্য করেছেন—"রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাহিত্যকে আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে একটা দৃষ্টি রহিয়াছে, সে দৃষ্টি মুখ্যতঃ চৈতন্যযুগেরই দান বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের দিব্য ভাবে এবং আচরণে তাঁহারা পরমভক্ত এবং পরম জ্ঞানিগুণী পরিবারবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম ; এই আবির্ভাবের দিব্যজ্যোতি এখনো বাঙালীর চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে এবং এই কারণেই আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের আস্বাদনকালে সাহিত্য রসের সহিত অধ্যাত্ম রসের মিশ্রণ না ঘটাইয়া পারি না, এই মিশ্রণ বা সমন্বয় ব্যতীত বৈষ্ণব সাহিত্যের আস্বাদনে কোথায় একটি অপূর্ণতা থাকিয়া যায়।"

(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৭৫)

প্রথম অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম : আড়বার গীতি

ভারতীয় সভ্যতা ধর্ম ভিত্তিক। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এক এক ধর্মমত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, চিত্রকলা নতুন নতুন প্রেরণা লাভ করে বিকাশের পথে এগিয়ে গেছে; আর এগিয়ে যেতে যেতে মানবজীবনের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে প্রবেশ করে নানা রসের উপাদান যুগিয়েছে; ও শেষ পর্যন্ত ধর্মগত প্রয়োজনের গণ্ডী অতিক্রম করে লৌকিক রসের সীমাহীন অতলতার মধ্যে মিশে গিয়েছে।

ধর্মানুভূতির গভীর অনুপ্রেরণায় ভারতীয় সংস্কৃতির সুর যে উচ্চ গ্রামে বাঁধা হয়েছিল, লৌকিক রসের ক্ষেত্রে সে সুর নেমে গেছে. ক্রমশঃ লঘু হয়ে হয়ে একেবারে হাল্‌কা হয়ে গেছে সত্য; কিন্তু প্রেরণার প্রথম দিকে লৌকিক অনুভূতির গভীরতা যে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার কারণ ধর্মানুভূতির প্রেরণা, সে কথা মানতেই হবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ শক্তিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলেই এ তথ্য নজরে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট ধরা পড়বে যে, যুগে যুগে ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মকে প্রাণের জিনিষ করে পেয়েছে। সমস্ত তর্ক জ্ঞান, যুক্তিকে অতিক্রম করে ভারতবর্ষের লোকে ভগবানকে বুকের অত্যন্ত কাছে টেনে এনে পরমাত্মীয় জ্ঞানে একান্ত আপনজনের মত ভালোবেসে শান্তি পেয়েছে।

এখানে উপযুক্ত হবে বলে এক বিদেশীর কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।· Madras wesley College এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ J. S. M. Hooper "The Heritage of India Series" এ "Hymns of the Alvars" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

The student of Hindu popular religion never sees the heart of it, never sees that it has a heart, unless he has felt something of the thrill that so deeply stirs his devout Hindu friend when in some great festival, the god passes by, or when he catches the glimpse of a Shrine, made sacred by the eager aspiration of many thousands.

Religion for most men in India, as in the West, is weakest where it is merely intellectual, and without emotional sympathy, the comparative study of religion must fail."

বিদেশী Mr. Hooper যে কথা বলেছেন, তা "ধর্ম" শব্দের ধাতুগত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। ধর্ম শব্দটা এসেছে "ধৃ" ধাতু থেকে, যার অর্থ "ধারণ করা"।

মানুষের হৃদয়ের অতলান্ত গভীরে যার বাসা, তাই পারে মানুষকে ধরে রাখতে, বাঁচিয়ে রাখতে। তাই দেখা গেছে, পৃথিবীর সর্বত্রই বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যে মানুষ জ্ঞান চর্চায় ক্লান্ত হয়েছে ; জ্ঞানের পথে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে ; বৈরাগ্যের কাঠিন্যে তৃপ্তিলাভ করতে পারেনি। অবশেষে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ভগবানকে পরম প্রিয় বলে জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের ইতিহাসের গোড়ার কথা এই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে যখন মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, হিংসা-জর্জরিত মানুষের কবলে মানুষ নিস্তারের পথ খুঁজে পায়নি, তখনই ভক্তিধর্মের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব মুহূর্তে বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও দাক্ষিণাত্যে আড়বারদের আবির্ভাবকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাসের সহস্র গীতি-গ্রন্থের ভূমিকায় একটা শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা
অন্ধ্রদেশে কচিদ্ কচিদ্ গূর্জরে বিলয়ংনীতা॥

শ্লোকটি উদ্ধৃত করে সুনীতিকুমার মন্তব্য করেছেন : ভক্তিধর্মের এইরূপ ইতিহাস, শ্লোকটিতে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা সর্বথা মানিয়া লইতে পারা যায় না। দক্ষিণাপথের মত উত্তরাপথেও ভক্তিধর্মের প্রসার ও বিকাশের কথা বিশেষ ভাবে গৌরবময় ; এ' কথা বলা চলে না যে আর্যভাষী জনগণের মধ্যে দক্ষিণ ভারত হইতে আগত ভক্তিবাদ গৃহীত হয় নাই, বা বিনষ্ট হইয়া

গিয়াছিল তবে এ কথাও ঠিক যে, ভক্তির পথে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সাহিত্যে বিধৃত প্রমাণ বিচার করিলে সর্বপ্রথমে দক্ষিণ ভারতেই ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং ভক্তি ধর্মের এক বিশিষ্ট ও মহিমাময় সাধক পরম্পরা প্রথমেই তামিল ভাষী (সঙ্কুচিত অর্থে দ্রাবিড় বা দ্রমিড় জাতীয়) জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। তামিল ভাষায় রচিত কতকগুলি কাব্যময় অমূল্য ভক্তিগ্রন্থকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্তি ধর্মের অন্যতম আকর শাস্ত্র বা "আধার গ্রন্থ" বলা যায়।

অধ্যাপক সুনীতিকুমারের মতে তামিলে অপূর্ব কবিত্বময় ও ভাবভক্তিময় ভক্তিকাব্য সৃষ্টির কারণ এখনও অজ্ঞাত, তবে তিনি মনে করেন, খ্রীষ্ট জন্মের পরে প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে পল্লব বংশীয় রাজারা এর সমধিক পুষ্টিতে সহায়তা করেন।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুনীতিকুমার আরো মন্তব্য করেছেন যে, পল্লবরাজগণ বিশেষ ভক্তিসহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন, এবং তাদের আগ্রহেই তামিল প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের লোকেরা উত্তর ভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণদের প্রচারিত বৈদান্তিক দর্শনের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতাবাদ ও পূজা অনুষ্ঠানাদি নূতন উৎসাহে গ্রহণ করতে থাকে। সম্ভবতঃ এর আগে বৌদ্ধ ও জৈন মতের শুষ্ক নীতি নিষ্ঠা ও ধর্মীয় বিচারের কাঠিন্য ধর্ম জীবনে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করে তুলছিল। লোকে তাতে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পাচ্ছিল না। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের মত ও মন্তব্য ইতিহাসের নজীরে সমর্থন করা যায়।

অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী তাঁর "A History of South India" গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় (Religion and Philosophy) তে লিখেছেন :

'T'ill about the fifth century A. D. harmony and tolerance characterized the relation between the different religious sects. The worship of primitive godlings with offerings of blood and toddy went on side by side with the performance of elaborate vedic sacrifices; the popular pantheon included many deities like Muruga, Siva, Vishnu, Indra, Krishna and others. Buddhists and Jains were found in considerable numbers in different parts of the country following their practices without let or hindrance. In the

story of Manimekalai for instance, we find the beroine advised to study in Kanchi, the philosophical systems of the Veda, Vishnu, Ajivaka, Jaina and of the Sankhya, Vaiseshika and Lokayata.

But soon a great change came—particularly in the Tamil Country—and people began to entertain fears of the whole land going over to Jainism and Buddhism. At any rate, worshippers of Siva and Vishnu felt the call to stem the rising tide of heresy. The growth on the one hand of an intense emotional Bhakti to Siva or Vishnu and on the other, of an out-spoken hatred of the Jains and Buddhists are the chief characte ristic of the new epoch. Challenges to public debate, competition in the performance of miracles, tests of the truth of doctrines by means of ordeal, became the order of the day. Parties of devotees under the leadership of one gifted saint or another, traversed the country many times over, singing, dancing and debating all their way. This great wave of religious enthusism attained its peak in the early seventh century and had not spent itself in the middle of the ninth".

সহস্রগীতি গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস শ্রীমদভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রাবিড়েষু চ ভূরিকাঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ১১।৫।৩৮-৪০

শ্লোকটা উদ্ধৃত করে মহারাজ আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস মন্তব্য করেছেন :

এই শাস্ত্র বাক্য কভু মিথ্যা নয়, কলির প্রারম্ভ হইতেই দ্রাবিড় দেশে, দক্ষিণ ভারতে, বহু নারায়ণ পরায়ণ পরম বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইহারা ছিলেন "আড়বার" নামে পরিচিত। "আড়বার" একটা তামিল শব্দ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে যিনি নিমগ্ন, ইহার ফলিত অর্থ "ভগবৎ প্রেমে নিমগ্ন মহাপ্রেমী ভক্ত"। মহারাজ রামানুজদাসের মতে শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বাদিত্য, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্যগণের বহু পূর্বে এই আড়বারগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং এঁরাই ছিলেন বৈষ্ণব ভাবধারার মূল উৎসস্বরূপ। এই স্বয়ংসিদ্ধ প্রেম পরবশ আড়বারেরাই ছিলেন প্রেমভক্তি, প্রচারের অগ্রদূতরূপী। কেবল তাই নয়, এঁদের মধ্যে একাধারে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়।

আড়বারেরা ছিলেন সংখ্যায় দ্বাদশ এবং এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শেঠ কোপ আড়বার।

অধ্যাপক T. A. Gopinath Rao স্যার সুব্রাহ্মণ্য আয়ার বক্তৃতামালায় শ্রীবৈষ্ণবদের ইতিহাস বিষয়ে যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক বিবরণ দিয়েছেন, তাতে আড়বারদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সকল তথ্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক রাও প্রথমে আড়বার সম্বন্ধে সমস্ত প্রচলিত কিংবদন্তী সংগ্রহ করে তারপরে প্রমাণের সাহায্যে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায় ॥ জ্ঞানযোগ ॥ এর ৭ম, ৮ম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীভগবানের এই বাণী অনুযায়ী বিষ্ণুর গদা, শঙ্খ, নন্দক ॥ খড়্গ ॥ ও চক্রের অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন চারজন আড়বার—১। পোয়কৈ, ২। ভূদত্ত, ৩। পেয়, ৪। তিরুমড়িসৈয়র।

পোয়কৈ আড়বার ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খের অবতার। তিনি কাঞ্চীপুরমে একটা ফুলের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মদিন ছিল শনিবার। জন্ম নক্ষত্র ছিল শ্রবণা এবং সাল ছিল দ্বাপর যুগ, ৮৬১৯০২ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪২০২।

পোয়কৈ এর জন্মের পরদিন কড়নমল্লই (মহাবল্লীপুরম) এ ভূদত্ত আড়বারও একটা ফুলের মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁর জন্ম নক্ষত্র ছিল ধনিষ্ঠা এবং তিনি ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর গদার অবতার।

প্রথম আড়বারের জন্মের তৃতীয় দিনে, ভূদত্তের জন্মের পরদিন পেয় আড়বারও একটা ফুলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম নক্ষত্র ছিল শতভিষা। তিনি ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর নন্দকের (খড়্গ) অবতার এবং তার জন্মস্থান ছিল মইলই (ময়লাপুর) উপরোক্ত তিনজন আড়বারই ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনজনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিদ্ধযোগী রূপে এবং মানুষের গর্ভজাত না হয়ে ফুলের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পোয়কৈ এবং ভূদত্ত তিরুকোবলুরে রাত কাটাবার জন্য এক জায়গায় এক মন্দিরের কাছে একটা পিয়াল গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গাছের নীচে দুজনের শোবার জায়গার অভাব হওয়ায় দুজনে ঠিক করলেন বসেই রাত কাটিয়ে দেবেন; এমন সময়ে তৃতীয় আড়বার পেয়ও রাত্রিতে ঝড়ের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি এসে সেই একই পিয়াল গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। শোওয়ার কথা তো দূরে, বসার জায়গায়ই নেই, তাই তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনজনের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন তিনজনেই অনুভব করলেন যে চতুর্থ একজন কেউ তাঁদের সঙ্গে সেই পিয়াল গাছের নীচে জায়গা করে নেবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। তিনজনেই ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন চতুর্থ আগন্তুক আর কেউ নয়, স্বয়ং হরি (বিষ্ণু) শ্রীবিষ্ণু তিন-যোগীকে দেখা দিয়ে তাঁর মূর্তি, তাঁদের স্মরণ পথে এনে দিলেন, দিয়েই অন্তর্হিত হলেন। এই অলৌকিক আবির্ভাবে অনুপ্রাণিত তিন যোগীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল তামিল ভাষায় পদাবলী। এক একজন একশ করে পদ পরচনা করলেন, নাম দিলেন "ইয়ার পা তিরুবন্দাদি"। এই পদগুলি নালায়ির প্রবন্ধমের অংশ বিশেষ।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার পর আড়বার তিনজনের সঙ্গে দেখা হল চতুর্থ আড়বার তিরুমড়িচৈএর তিরুবল্লিকেণিতে ॥ বর্তমান (Triplicane) ॥ সেখান থেকে চারজন আড়বাই গেলেন মইলইতে, পেয় আড়বারের জন্মস্থানে, তারপর আড়বার চারজন আবার নিজেদের ইচ্ছামত বেরিয়ে পড়লেন।

তিরুমড়িচৈএর জন্ম সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একদিন ঋষিরা ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন যে, অল্প কিছুদিন তপস্যার জন্য পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা কোনটা। অনেক জায়গার গুণাগুণ বিচার করে স্থির হল তিরুমড়িচৈ ঋষিদের পক্ষে উপযুক্ত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঋষিরা তিরুমড়িচৈএ গিয়ে বাস করতে লাগলেন। তিরুমড়িচৈএ ভার্গবঋষির

স্ত্রী একটা পুত্রের জন্ম দেন ; কিন্তু ভার্গবঋষি তাকে পথের পাশে পরিত্যাগ করেন। তিরুবালন নামে এক নিঃসন্তান শূদ্র পরিত্যক্ত শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে পরম আদরযত্নে লালন পালন করতে থাকেন। এক ধর্মপ্রাণ গোপ শিশুটির জীবন রক্ষা করল দুধ যুগিয়ে। পরে এই গোপেরও একটি পুত্র হয়, নাম কণিকন্নন। কণিকন্নন পরে তিরুমড়িচৈএর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিরুমড়িচৈ বুঝতে পারলেন জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা। তিনি নানা হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করে প্রচলিত মতামতগুলি বিচারের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন, হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে সেই জ্ঞানের সাহায্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তত্ত্বের মধ্যে সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। চার্বাক দর্শন এবং গোঁড়া শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম তত্ত্বের সারাংশ বিচার করে তার মধ্যেও সত্যের অনুসন্ধান করলেন তিনি, কিন্তু এত করা সত্ত্বেও তাঁর অশান্ত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হল না। অতি অবশেষে বৈষ্ণব ভক্তি ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার পথ খুঁজে পেলেন অস্থির চিত্ত তিরুমড়িচৈ। মধুর পদাবলী রচিত হল তাঁর কণ্ঠে। তিরুবল্লিকেণিতে সাতশ বৎসর অতিবাহিত করে তিরুমড়িচৈ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করলেন শিবকে পরাজিত করে। শিব তাঁকে উপাধি ভূষিত করলেন "ভক্তিসার"।

তিরুবল্লিকেণিতেই তিরুমড়িচৈএর সঙ্গে পোয়াকৈ, ভূদত্ত ও পেয় আড়বারদের বন্ধুত্ব হয়। তিরুবল্লিকেণি থেকে তিরুমড়িচৈ পেয় আড়বারের জন্মস্থান মইলই পরিদর্শন করে নিজ জন্মস্থান থেকে শিষ্য কণিকন্ননকে নিয়ে কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হলেন।

কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজ তিরুমড়িচৈএর মাহাত্ম্যের কথা শুনে শিষ্য কণিকন্ননের মারফৎ তাঁর কাছে অনন্ত যৌবন ভিক্ষা চাইলেন। পল্লবরাজের প্রার্থনায় বিরক্ত বোধ করে তিরুমড়িচৈ পল্লবরাজের রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন পাশের গ্রামে ওরিরুই বা ওরিরবিরুক্কইএ। তিরুমড়িচৈএর সঙ্গে সঙ্গে পল্লব রাজধানীর মন্দিরের বিগ্রহও রাজধানী থেকে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন সকালে পল্লবরাজের কাছে সংবাদ পৌছলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে অপরাধের জন্য তিরুমড়িচৈএর কাছে গভীর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও তাঁকে এবং মন্দিরের বিগ্রহকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলেন। কিছুদিন পল্লব রাজধানীতে কাটাবার পর তিরুমড়িচৈ তীর্থভ্রমণে কুম্ভকোণমে চলে যান এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেইখানেই অতিবাহিত করেন।

তিরুমড়িচৈ তামিল ভাষায় দুইখানি কাব্য রচনা করেন—"তিরুবিরুত্তম্" ও "নাম্মুগণ তিরুবন্দাদি"।

তিরুমড়িচৈ ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনের চক্রের ॥ অবতার। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ৪,৭০০ বৎসর বেঁচে ছিলেন।

আড়বার সম্প্রদায়ের এই চারজন ছাড়া আরো আটজনের নাম পাওয়া যায়।

কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড়বার তিরুক্কুরুগইএর শহরতলী তিরুনগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম "কারী" ও মাতার নাম "উড়ইয়নঙ্গই"।

অন্যান্য চারজন আড়বারের মত নম্মাড়বারও সিদ্ধযোগী ছিলেন। শৈশবেই তিনি গৃহত্যাগ করেন ও নিকটস্থ একটি তেঁতুল গাছের নীচে ষোলো বৎসর সমাধিস্থ অবস্থায় থাকেন। নম্মাড়বার ৩৫ বৎসর বেঁচে ছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল এক হাজার শ্লোক রচনা করার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছিলেন তিরুবায়মোড়ি, তিরুবিরুত্তম্ ; তিরুবিশইপুপ ; পেরিয় ; তিরুবন্দাদি। শঠকোপ, বকুলাভরণ ও পরাণকুশ এইসব নামেও নম্মাড়বার পরিচিত ছিলেন। নম্মাড়বার জাতিতে শুদ্র ও "বিশ্বক্ষেণে"র অবতার ছিলেন। নম্মাড়বারের শিষ্য ছিলেন "মধুর কবি"। মধুর কবি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিরুক্কোড়ুর ছিল তাঁর জন্মস্থান। মধুর কবি তীর্থ ভ্রমণে অযোধ্যায় গিয়ে শোনেন যে, নম্মাড়বার দক্ষিণ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। মধুর কবি তৎক্ষণাৎ তিরুনগরীতে গিয়ে উপস্থিত হন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মধুর কবি নম্মাড়বারের মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। মধুর কবি শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর "তিরুবায়মোড়ি" রচনা করতে নম্মাড়বার সাড়ে চার বৎসর অতিবাহিত করেন। মধুর কবি তাল পাতায় সম্পূর্ণ তিরুবায়মোড়ির প্রতিলিপি করেন।

নম্মাড়বার সম্বন্ধে—A. T. Gopinath Rao—যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত দুটি প্রস্তর লিপির উল্লেখ করেছেন। তিনি স্যার সুব্রাহ্মণ্য আয়ার বক্তৃতামালায় শ্রীবৈষ্ণবদের ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"In the year 1906 when I paid a sasual visit to the Anaimalai hill near Madura, I chanced to discover two valuable stone inscriptions belonging to the reign of the early

Pandya King Jatavarman Parantaka Pandya. One of these is in Sanskrit and the other tn Tamil".

এই দুটি শিলালিপির প্রমাণ অনুসারে গোপীনাথ রাও স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে নম্মাড়বারের জীবৎকাল নবম শতাব্দী।

শিলালিপি দুটির প্রথমটিতে আছে :

১। শিলালিপিটার কাল কলিযুগের ৩৮৭১ ।। বিগত ।।

২। শিলালিপিটা পাণ্ড্যরাজা পরান্তকের রাজত্বকালে খোদিত।

৩। পাণ্ড্যরাজা পরান্তকের উত্তর মন্ত্রী করবন্দপুরবাসী বৈদ্য বংশজাত মারের পুত্র একটি বিষ্ণু মন্দির খুঁড়ে বার করেন ও তার মধ্যে বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মারের পুত্রের নাম ছিল মধুর কবি। তিনি মধুর পদ রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

এ গোপীনাথ রাওএর মতে শিলালিপিতে ক্ষোদিত তারিখ কলিযুগ ৩৮৭১ ।। বিগত ।। ৭৭০ খৃষ্টাব্দ। দেখা যাবে ৭৭০ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজা পরান্তক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী তাঁর দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস গ্রন্থ "A History of South India"-য় পাণ্ড্যরাজাদের যে বিবরণ দিয়েছেন, সেই অনুসারে পাণ্ড্যরাজ্যে অরিকেশরী পরাণকুশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কোচ্ছড়ইয়ন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি "রণধীর" নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ৭০০-৭৩০ খৃষ্টাব্দ। প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের সীমা "কোঙ্গু" প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি "তিন্নেভেলী" ও ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশের বিদ্রোহী নেতা "আয়"কে স্ববশে আনেন।

কোচ্ছড়ইয়ন বা রণধীর পাণ্ড্যের পুত্র মারবর্মন প্রথম রাজসিংহ "কোঙ্গু" প্রদেশে পাণ্ড্যরাজাদের অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে কাবেরী নদী অতিক্রম করে ত্রিচিনোপলী ও তাঞ্জোর প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত প্রদেশের মড়কোঙ্গম অধিকার করেন, বেণবই নামক স্থানে। চালুক্যরাজ ও তাঁর অধীনস্থ রাজাদের পরাস্ত করে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন ও গঙ্গাবংশীয় রাজ-কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন।

মারবর্মন প্রথম রাজসিংহের পুত্র জটিল পরান্তক নেড়ুনজড়ইয়ন, ওরফে প্রথম বরগুণ মহারাজ ৭৬৫-৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দ্বিতীয়

নন্দীবর্মন পল্লবমল্লের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরী নদীর দক্ষিণে পেন্নাগড়মে পল্লবেরা পাণ্ড্যদের নিকটে প্রচণ্ড পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়।

নন্দীবর্মন পল্লবমল্ল পাণ্ড্যরাজ্য পরান্তককে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। পরান্তক পাণ্ড্য ত্রিবাঙ্কুর অধিকার করে তাঁর রাজ্য সীমা তাঞ্জোর সালেম, কয়েমবেটর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

গুরু পরম্পরায় নম্মাড়বার সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার সঙ্গে "আণইমলই" শিলালিপিতে ক্ষোদিত তথ্যের অনেক মিল আছে। কিংবদন্তী অনুসারে

১। নম্মাড়বার কারীর পুত্র ছিলেন, কারী পাণ্ড্যরাজের অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। নম্মাড়বারের মাতার জন্মস্থান ছিল "তিরুবণপরিশারম্"।

২। নম্মাড়বারের শিষ্যের নাম ছিল "মধুর কবি।"

৩। নম্মাড়বার কারীমারণ, পরাণকুশন ও শঠকোপন নামেও পরিচিত ছিলেন।

৪। নম্মাড়বার তিরুক্কুরুগূরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আণইমলই শিলালিপিতে ক্ষোদিত—

১। পাণ্ড্যরাজ্যের উত্তর মন্ত্রীর নাম ছিল "মারণকারী" অর্থাৎ "মারের" পুত্র কারী। কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড়বারের এক নাম কারীমারণ, অর্থাৎ "কারীর পুত্র মার"।

২। আণইমলই শিলালিপিতে ক্ষোদিত রাজার নাম পাণ্ড্যপরান্তক। কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড়বারের পিতা "কারী" পাণ্ড্যরাজের অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন।

৩। আণইমলই শিলালিপিতে ক্ষোদিত পাণ্ড্যরাজের উত্তরমন্ত্রী মারণকারীর জন্মস্থান "করবন্দপুর"।

কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড়বারের মায়ের জন্মস্থান ছিল তিরুবণ পরিশারম্ করবন্দপুরের খুব নিকটবর্তী স্থান।

আণইমলই শিলালিপিতে আছে পাণ্ড্যরাজ পরান্তকের উত্তরমন্ত্রী মারের পুত্র মধুর কবি নামে পরিচিত ছিলেন মধুর পদাবলী রচনা কুশলতার জন্য।

কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড়বারের শিষ্যের নাম ছিল মধুর কবি সম্ভবতঃ নম্মাড়বার শিষ্যের প্রতি প্রসন্নতাবশতঃ পিতার উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। গোপীনাথ রাও, নম্মাড়বারের অপর একটি নাম পরাণকুশনের

এই রকমই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—সুদূর অতীতে দাক্ষিণাত্যের নৃপতিরা তাঁদের অধীনস্থ বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের সম্মানিত করতেন তাঁদের নামের সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়ে দিয়ে। এই প্রথা অনুসারেই নম্মাড়বার "পরাণকুশন" নামেও পরিচিত ছিলেন।

এই সব তথ্য থেকে অধ্যাপক গোপীনাথ রাও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নম্মাড়বার পরান্তকের উত্তর মন্ত্রী মরণকারীর পুত্র ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি তার প্রখ্যাত তিরুবায় মোড়ি রচনা করেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল "তিরুকুরুগুর"।

তাঁর শিষ্যের নাম ছিল "মধুর কবি"।

নম্মাড়বারের প্রায় সব সাময়িক কুলশেখর আড়বার। তিনি উড়ইয়র, কোল্লিনগর, কুদল ॥ মাদুরা ॥, কোঙ্গু প্রভৃতি স্থানের রাজা বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি অগাধ ভক্তিবশতঃ কুলশেখর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব ত্যাগ করে শ্রীরঙ্গমে বসবাস করেন। তিনি শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের কিছু অংশ নির্মাণে সাহায্য করেন। তিনি তামিল ভাষায় "পেরুমাল তিরু মোড়ি" এবং সংস্কৃত "মুকুন্দ মালা" রচনা করেন।

পেরিয়াড়বারের রচনায় "মারণ—শ্রীবল্লভের" উল্লেখ থেকে জানা যায় যে পেরিয়াড়বার ও তাঁর কন্যা আণ্ডাল পাণ্ড্যরাজ শ্রীবল্লভদেবের সমসাময়িক।

মারণ শ্রীবল্লভ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাণ্ড্যরাজ প্রথম বরগুণের পুত্র শ্রীমার শ্রীবল্লভ ॥ এর রাজত্বকাল ৮১৫-৮৬২ খৃষ্টাব্দ। ইনি ৮১৫-৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সেনের রাজত্বকালে সিংহাসন আক্রমণ করেন এবং তার পরেই পল্লবদের সঙ্গে তাঁকে ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এই ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে পেরিয়াড়বার ও তাঁর কন্যা আণ্ডালের জীবৎকাল নবম শতাব্দী।

পেরিয়াড়বারের প্রকৃত নাম, "বিষ্ণু চিত্ত"। তিনি ছিলেন গরুড়ের অবতার এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল "শ্রীবিল্লিপুত্তুর" কিংবদন্তী অনুসারে রাজসমীপে এক ব্রাহ্মণকে ধর্ম বিষয়ক তর্কে পরাজিত করে পেরিয়াড়বার প্রচুর ধন ও ভট্টপিরাণ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পেরিয়াড়বার ফুলের বাগানে মালীর কাজ করতেন ও শ্রীবিল্লিপুত্তুরের বিষ্ণুমন্দিরের বিগ্রহের জন্য ফুলের যোগান দিতেন।

পেরিয়াড়বারের রচিত তামিল পদাবলী সংগ্রহ—"পেরিয়াড়বরে তিরুমোড়ি" নামে পরিচিত।

কিংবদন্তী অনুসারে পেরিয়াড়বার একটা শিশু কন্যাকে ফুলের বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পান ও তাকে কন্যারূপে পালন করেন।

পেরিয়াড়বারের এই পালিতা কন্যাই আণ্ডাল নামে পরিচিত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পেরিয়াড়বার আণ্ডালকে ধর্ম ও সংসার উভয় বিষয়েই নানা শিক্ষা দান করেন এবং আণ্ডাল তাঁর পালক পিতাকে ধর্মকর্মে ও নানা শাস্ত্রাচার পালনে সাহায্য করতে বিশেষ উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আণ্ডাল একটি প্রলোভন থেকে কিছুতেই নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন না ; প্রতিদিন পেরিয়াড়বার দেবতার জন্য যে ফুলের মালা গেঁথে রাখতেন, আণ্ডাল পিতার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চুপি চুপি সেই মালা নিজের গলায় পরতেন, আবার খুলে ঠিক জায়গায় রেখে দিতেন। পেরিয়াড়বার কিছু না জেনে প্রতিদিনই আণ্ডালের ব্যবহার করা মালা দেবতাকে নিবেদন করতেন।

একদিন আণ্ডাল ধরা পড়ে গেলেন। পেরিয়াড়বার কন্যাকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন দেবতার ফুল অপবিত্র করবার জন্য, এই অন্যায় অপরাধ আর কখনো যেন না হয়। সেই রাত্রেই দেবতা স্বপ্নে পেরিয়াড়বারকে জানিয়ে দিলেন যে একমাত্র আণ্ডাল (অন্য কেউ নয়) যে মালা গলায় পরেন, সেই মালা গলায় পরতেই তাঁর সবচেয়ে বেশী আনন্দ। পরদিন থেকে পেরিয়াড়বার আণ্ডালের গলার মালাই দেবতাকে দিয়ে আসতেন। দেবতাকে নিবেদন করবার ফুলে আণ্ডাল আগে নিজে সাজতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল "শূরিক্কোড়ুত্ত নাচ্চিয়ার।"

আণ্ডাল যৌবনে পদার্পণ করলেন, কিন্তু একমাত্র ভগবান রঙ্গনাথ ছাড়া আর কাউকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। স্বপ্নে ভগবান রঙ্গনাথ পেরিয়াড়বারকে জানিয়ে দিলেন আণ্ডালকে তিনি পরিণয়ে গ্রহণ করতে আগ্রহী। মহাধূমধামে বধূবেশে সজ্জিতা আণ্ডালকে চতুর্দোলায় চড়িয়ে পেরিয়াড়বার শ্রীবিল্লিপুত্তুর থেকে শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের মন্দিরে নিয়ে যান। শোনা যায় আণ্ডাল রঙ্গনাথের বিগ্রহের সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্তর্হিতা হন।

আণ্ডালের রচিত তামিল পদ সংগ্রহের নাম "নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি।" আণ্ডাল রচিত আর একটা পদাবলী সঙ্কলন গ্রন্থ "তিরুপ্পাবৈ।" তামিল সাহিত্যের এটা একটা প্রসিদ্ধ রচনা।

আণ্ডালের পরবর্তী তিনজন আড়বার তোণ্ডরড়িপপোড়ি, তিরুমঙ্গই ও তিরুপ্পান। এঁরা তিনজন প্রায় সমসাময়িক। তিরুমঙ্গই-এর রচনা থেকে

এঁদের জীবংকাল নির্ধারণ করা যেতে পারে। অধ্যাপক গোপীনাথ রাও তিরুমঙ্গই আড়বারের রচনা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর রচনায় কাঞ্চীর বিষ্ণুমন্দির "পরমেচ্চুর ভিন্নগরম্"-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। এই মন্দির নন্দীবর্মন পল্লবমল্লের পূর্ববর্তী নৃপতি দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মন নির্মাণ করেছিলেন এবং এই মন্দিরের প্রাচীন গাত্রে নন্দীবর্মনের সঙ্গে পল্লববংশীয় চিত্রমায় ও পাণ্ড্যরাজ প্রথম পরান্তকের যুদ্ধের চিত্র ক্ষোদিত আছে। মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনপল্লী জিলার অন্তর্বর্তী মুগালুরের নিকটবর্তী করুম্বুর নামক স্থানে পাণ্ড্যরাজ প্রথম পরান্তক নন্দীবর্মণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন, এই যুদ্ধের উল্লেখ তিরুমঙ্গই-এর রচনায় আছে এবং বিজয়ী পল্লব নৃপতি কাঞ্চীর পরমেচ্চুর ভিন্নগরম্-এর বিষ্ণু মন্দিরের বিগ্রহের পূজারী ছিলেন, এও উল্লিখিত আছে। এই তথ্য অনুসারে করম্বুরের যুদ্ধ বিজয়ী পল্লব নৃপতিই যে নন্দীবর্মন পল্লবমল্ল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নন্দীবর্মন পল্লবমল্লের "রণডঙ্কার" নাম ছিল "কডুবায়মরট"। তিরুমঙ্গই-এর রচনায় এই রণডঙ্কার উল্লেখ আছে এবং এর নিনাদ সমুদ্রগর্জনের ন্যায় বলে বর্ণিত হয়েছে।

তিরুমঙ্গই-এর রচনায় "পল্লববৈরমেঘের" উল্লেখ আছে। অধ্যাপক গোপীনাথ রাও-এর মতে এই "পল্লববৈরমেঘ" ও নন্দীবর্মন পল্লবমল্লের পুত্র দন্তিবর্মন পল্লবমল্ল একই ব্যক্তি। এইসব থেকে অধ্যাপক রাও প্রমাণ করছেন, যে, তিরুমঙ্গই ও তাঁর সমসাময়িক তোণ্ডরডিপ্পোডি ও তিরুপ্পান আড়বারের জীবংকাল নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

তিরুমঙ্গই আড়বার সম্বন্ধে অধ্যাপক গোপীনাথ রাও এবং অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী একমত।

"A History of South India" গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে (Conflict of three Empires) এ "অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেছেন :—"After the failure of his plans against Varaguna, Nandi Varman Pallavamalla continued to rule till about 795, Pallavamalla was a great worshipper of Vishnu and a great patron of learning. He renovated old temples and built several new ones. Among the latter was the Vaikuntha Perumal temple at Kanchipuram which contains inscrible penels of

sculpture, portraying the events, leading up to the accession of Pallavamalla to the throne. The great Vaishnava saint "Tirumangai" was his contemporary.

Nandi Varman was succeeded by his son "Danti Varuma (C. 795—845)."

কিংবদন্তী অনুসারে তিরুমঙ্গই ছিলেন "কল্লর" অর্থাৎ "পেশাদার ডাকাত" ও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "নীল"। ভগবান্ বিষ্ণুর শ্যামতনুর সুষমাব্যঞ্জক এই নাম।

তিরুমঙ্গই-এর পিতা চোলরাজের একজন সেনাপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিরুমঙ্গই ঐ পদ প্রাপ্ত হন এবং তিরুবালি প্রদেশের নৃপতির অধীনে রাজা হন।

গল্প আছে, তিরুমঙ্গই এক বৈষ্ণবচিকিৎসকের পালিতা কন্যা, অপ্সরাতুল্যা কুমুদবল্লীর প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হন। কুমুদবল্লীর পালক পিতা তাঁকে একটি পদ্মের মধ্যে পেয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম দেওয়া হয় "কুমুদবল্লী"। কুমুদবল্লী প্রকৃত বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কারুর পত্নীত্ব স্বীকারে রাজী না হওয়ায় তিরুমঙ্গই-এর প্রণয় ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ প্রণয়ের হতাশা ও বেদনা-বিক্ষুব্ধ চিত্তের জ্বালা প্রশমনের উদ্দেশ্যে তিরুমঙ্গই দিনরাত্রি বিষ্ণুর নিকট বৈষ্ণব হবার জন্য আকুল প্রার্থনা করতে থাকেন। তিরুমঙ্গই-এর আকুল প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁর দেহে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি দ্বাদশ চিহ্ন অঙ্কিত করে দেন। এরপর থেকেই "তিরুমঙ্গই" নতুন নাম প্রাপ্ত হন "নীল" এবং কুমুদবল্লীর সঙ্গে তাঁর পরিণয়ে আর কোন বাধা থাকে না।

কুমুদবল্লী তিরুমঙ্গইকে একটি সর্তে আবদ্ধ করেন—প্রতিদিন ১,০০৮ বৈষ্ণবকে ভোজন করাতে হবে। তিরুমঙ্গই সর্ত পালন করলেন রাজকোষ থেকে অর্থ অপহরণ করে। ফলে তাঁর প্রভু তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। গল্প আছে, বন্দী অবস্থায় কাঞ্চীপুরমের বিষ্ণুমন্দিরের বিগ্রহ "বরদরাজ স্বামী" "তিরুমঙ্গই"কে গুপ্তধনের সন্ধান দেন, তাই দিয়ে তিনি নিজে কারামুক্ত হন ও কিছুদিন পর্যন্ত বৈষ্ণব-ভোজনের ব্যয় বহন করেন। দেবতা দত্ত ধন যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তিরুমঙ্গই ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করে বৈষ্ণব-ভোজনের ব্যয় বহন করতে থাকেন।

কথিত আছে, ভগবান বিষ্ণু তিরুমঙ্গই-এর পুণ্য কাজে যার পর নাই সন্তুষ্ট

হয়ে ধনী ব্রাহ্মণ পথিক বেশে তিরুমঙ্গই কর্তৃক লুণ্ঠিত হন। তিরুমঙ্গই লুণ্ঠিত ধন মাটি থেকে তুলতে পারেন না, ব্রাহ্মণ তখন তাঁর কানে একটি মন্ত্র দেন— এই মন্ত্র চারিটি বেদের সংক্ষিপ্তসার। এই মন্ত্রের অভিনব শক্তিতে তিরুমঙ্গই ব্রাহ্মণকে দেখতে পান লক্ষ্মী সহ গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন হৃষীকেশ মূর্তিধারী বিষ্ণুরূপে।

ভগবদ্দর্শনের আনন্দে অনুপ্রাণিত তিরুমঙ্গই শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেন—পেরিয়া তিরুমোড়ি; তিরুকুরুন তাণ্ডহম; তিরুণেন্দু তাণ্ডহম; তিরুবেরু কুত্তিরুক্কই; সিরিয় তিরু মডল, ও পেরিয় তিরুমড়ল।

শীয়ালি নামক স্থানে তিরুমঙ্গই শৈবযোগী সম্বন্ধরকে (জ্ঞান সম্বন্ধ) তর্কে পরাস্ত করেন। সম্বন্ধর তিরুমঙ্গইকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁকে নিজের ত্রিশূল উপহার দিয়ে। তিরুমঙ্গই-এর প্রতিটি মূর্তির উপর এই ত্রিশূল চিহ্নিত আছে। এরই জন্য তাঁর নাম হয় "পরকলর"।

তিরুমঙ্গই শেষ জীবনে শ্রীরঙ্গমের বিগ্রহ। ভগবান্ রঙ্গনাথের আদেশ পান শ্রীরঙ্গমের মন্দির নূতন করে এবং বৃহৎ ক'রে নির্মাণ করবার জন্য। কিংবদন্তী অনুসারে তিরুমঙ্গই নাগপট্টমের বৌদ্ধ বিহারের সোনার বুদ্ধ মূর্তি ডাকাতি ক'রে আনেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত অর্থে শ্রীরঙ্গমের মন্দির নির্মাণ সুরু করেন।

তিরুমঙ্গই ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর কার্মুকের অবতার। শ্রীবিষ্ণু তাঁকে দশ অবতার রূপেই দর্শন দেন।

তিরুমঙ্গই শ্রীরঙ্গম থেকে তিরুক্কুরুন গুড়িতে চ'লে যান এবং সেইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিংবদন্তী অনুসারে তিরুপ্পান আড়্‌বার এক "পানার" অথবা বংশীবাদক ও তাঁর স্ত্রীর পালিত পুত্র। নিঃসন্তান বংশীবাদক ত্রিচিনপল্লী জিলার উরইউর গ্রামের একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে তিরুপ্পানকে কুড়িয়ে পান এবং নিজ পুত্র জ্ঞানে তাঁকে লালন পালন করেন। অতি শৈশবেই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের বিগ্রহ রঙ্গনাথের প্রতি তিরুপ্পানের গভীর ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

নীচকুলে জন্মের কথা স্মরণ ক'রে তিরুপ্পান কখনো কাবেরী নদী পার হ'য়ে দ্বীপ সদৃশ শ্রীরঙ্গমের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করতেন না। কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে ব'সে আপন মনে রঙ্গনাথের স্তব গান করতেন। একদিন লোক-সারঙ্গ-মহামুনি শ্রীরঙ্গমের বিগ্রহের স্নানের জল আনার উদ্দেশ্যে যেখানে তিরুপ্পান বসে আছেন, সেইখানে যান। ব্রাহ্মণ আদেশ করেন তিরুপ্পানকে সরে যেতে—

কেননা তার ছায়ায় দেবতার স্নানের জল অপবিত্র হবে। তিরুপ্পান কিছুই শুনতে পান না; ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে তিরুপ্পানকে পাথর ছুঁড়ে মারেন। তিরুপ্পানের চমক ভাঙে; অতি দীন ভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মণ জল তুলে মন্দিরে নিয়ে যান; কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান যখন দেবতা সেই জল প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর পরম ভক্ত অন্ত্যজের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য কঠিন তিরস্কার করেন।

অবশেষে মহামুনিকে দেবতার আদেশে তিরুপ্পানকে কাঁধে ক'রে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে নিয়ে আসতে হয়।

এই দিব্য অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিরুপ্পান দশটি শ্লোকে "অমলনদি-পিরাণ" রচনা করেন।

কিংবদন্তী অনুসারে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিরুপ্পান শ্রীরঙ্গমের বিগ্রহের সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্তর্হিত হন।

তিরুপ্পান আড়বার তিরুমঙ্গই-এর সমসাময়িক।

তিরুমঙ্গই-এর প্রায় সমসাময়িক নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর একজন আড়বারের বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি "তোণ্ডরড়িপ্পোড়ি"।

কিংবদন্তী অনুসারে তোণ্ডরড়িপ্পোড়ি মণ্ডন গুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "বিপ্রনারায়ণ"। পেরিয়াড়বারের মত তোণ্ডরড়িপ্পোড়িও ফুলমালীর কাজ করতেন এবং শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে ভগবান্ রঙ্গনাথের বিগ্রহ-সেবার ফুল যোগান দিতেন।

গল্প আছে, বিপ্রনারায়ণ এক পতিতা নারী—দেবদেবীর ছলা-কলায় মুগ্ধ হ'য়ে আত্ম-বিস্মৃত হন। অবশেষে ভগবান্ রঙ্গনাথ স্বয়ং উদ্ধার কর্তা হ'য়ে বিপ্রনারায়ণকে সকল পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

বিপ্রনারায়ণ আবার শ্রীরঙ্গমে ফিরে গিয়ে পূর্বেকার মত দেবতার সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন, ও নতুন নাম নেন—"তোণ্ডরড়িপ্পোড়ি"। অর্থাৎ "শ্রীভগবানের দাসানুদাসের চরণ-রেণু"।

তোণ্ডরড়িপ্পোড়ির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে তাঁর দুইটি কবিতায়—"তিরুমাল" (পবিত্র মালা) এবং তিরুপল্লী ইয়েলুচি (শ্রীভগবানের জাগরণ)। তোণ্ডরড়িপ্পোড়ি বৌদ্ধ ও জৈনদের ঘোর বিরোধী ছিলেন; তাঁর রচনায় শৈববিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়।

। ২ ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধর মুখার্জি বক্তৃতামালায় বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ে বলেছেন :

"ভাগবতে দ্রাবিড়দেশে বৈষ্ণবগণের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। আচার্য রামানুজ দক্ষিণ দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভাগবতের পঞ্চরসপ্রবণ বৈষ্ণবোপাসনামার্গের কোনো প্রকার ইঙ্গিত স্বগ্রন্থে কোনো স্থানেই করেন নাই এবং ভাগবতের কোন বচনও উদ্ধৃত করেন নাই। অথচ বিষ্ণু পুরাণের বহু বচনই প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি প্রমাণও করিয়াছেন।

এক কথায় বলিতে গেলে আচার্য রামানুজ বর্ণিত "বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ" বিষ্ণু পুরাণের বচন সমষ্টির উপরই নির্ভর করে বেশী।

প্রমথনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন :—শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদিত, গোপীভাবপ্রবণ বৈষ্ণব সাধনা আচার্য শ্রীরামানুজ ও মধ্ব কর্তৃক অঙ্গীকৃত ও প্রচারিত হয় নাই বলিয়া তত্তৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহার তেমন আদর নাই। নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইহা আংশিক ভাবে সমাদৃত হইলেও মধুর রসের সর্বোৎকৃষ্টতা তদাস্বাদানকূল সাধনার প্রবর্তক উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে যে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় মধুর রসপ্রধান সাধন প্রণালী যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য এই চতুর্বিধ ভক্তিরসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মধুর রসের প্রকর্ষ তাহাতে পরিলক্ষ হইলেও তদাস্বাদানুকূল কোনো প্রকার বিশিষ্ট সাধনা পদ্ধতি যে বাঙ্গালার সাধারণ জনগণের মধ্যে বা শিষ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই।

রাধাতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র বিষ্ণুযামল প্রভৃতি কতিপয় তন্ত্রে এই বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তন্মূলক সুশৃঙ্খল বৈষ্ণব সাধনা-প্রণালী শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বে যে বঙ্গদেশে প্রবর্তিত ছিল, তাহার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নাই। আসল কথা, এই যে, মানস-বৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে বাসপূর্বক মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধার সহকারিভাব স্বরূপা সখীগণের আনুগত্য দ্বারা রসরাজ-মূর্তি রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্যই

জীবন উৎসর্গ করারূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশ বা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে প্রচারিত হইয়া ছিল বা অনুষ্ঠিত হইত, তাহার কোনো প্রমাণ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষাতে লিখিত বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের যে সারাংশ, তাহা অন্য কোনো দেশে প্রচলিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে যে গৃহীত হয় নাই ইহা স্থির।"

প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিমতের সমর্থনে আচার্য রামানুজের "বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ" ও শ্রীজীবগোস্বামীর "অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের" তুলনামূলক সমালোচনা প্রয়োজন।

অদ্বৈতবাদে—ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ বিশিষ্টরূপে অদ্বিতীয়, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। এই ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি আছে; (১) পরাশক্তি (২) অপরাশক্তি—বা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি ও (৩) অবিদ্যাশক্তি। পরাশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ইত্যাদি।

অপরাশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম জীবভূত।

ব্রহ্মের অবিদ্যাশক্তি জীবের কর্মস্বরূপ।

প্রলয় অবস্থায় ব্রহ্ম কারণরূপে বিরাজ করেন অর্থাৎ জীব ও জগৎ তখন সূক্ষ্ম কারণরূপে ব্রহ্মে লীন থাকে। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে কারণবস্থ ব্রহ্ম বলা হয় সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম কার্যবস্থ হইলে জীব ও জগৎ অভিব্যক্ত হয়।

ব্রহ্ম "শেষী" অর্থাৎ প্রধান ও প্রকারী অর্থাৎ বিশেষ্য জীব ও জগৎ "শেষ" অর্থাৎ অপ্রধান ও অঙ্গ এবং প্রকার অর্থাৎ বিশেষণ।

রামানুজ মতে ব্রহ্মেরই পরিণাম ঘটিয়া জীব ও জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামীর "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" মতে পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হইয়াও ব্যক্তি স্বরূপ ও বিগ্রহ যুক্ত। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই সেই বিগ্রহ যিনি সর্বব্যাপী হইয়াও বিগ্রহবান্ ও নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য লীলায় ব্যাপৃত। তাঁহার তিনটি শক্তি আছে; (১) স্বরূপ শক্তি, (২) তটস্থা শক্তি ও (৩) মায়া শক্তি।

পরব্রহ্মের (১) স্বরূপ শক্তির দ্বারা পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইয়াও বিগ্রহধারী এবং নিত্যবৃন্দাবন বনে নিত্যপরিকর প্রভৃতি আবির্ভূত করিয়া নিত্যলীলায় ব্যাপৃত থাকেন। এই স্বরূপে তিনি কার্যকারণের অতীত, অপ্রাকৃত ভূমিতে বিদ্যমান। এই স্বরূপ শক্তির দ্বারাই তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য ও নানাবিধ বিরুদ্ধ শক্তিরও আশ্রয় হইতে পারিয়াছেন।

(২) তটস্থা শক্তির বা জীব শক্তির সাহায্যে অর্থাৎ সেই শক্তিরই পরিণামরূপে সকল জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং জীব পরব্রহ্মের তটস্থা শক্তির পরিণাম।

(৩) মায়াশক্তি পরিণত হইয়া জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সুতরাং জীব ও জগৎ পরব্রহ্মের তটস্থা শক্তি ও মায়াশক্তির পরিণাম; পরব্রহ্মের পরিণাম নহে।

পরব্রহ্মের তিনটি আবির্ভাব—

(১) ভগবান।

(২) পরমাত্মা।

(৩) পরব্রহ্ম।

শ্রীজীবের মতে পরব্রহ্ম স্বরূপশক্তির সাহায্যেই উপরোক্ত তিনরূপে আবির্ভূত হন; এবং ত্রিবিধ উপাসক পরব্রহ্মকে এই তিনরূপে উপলব্ধি করেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে পরব্রহ্মের মুখ্য আবির্ভাব স্বয়ংভগবৎরূপে অনন্ত ঐশ্বর্য ও শক্তির আশ্রয়রূপে সর্বব্যাপী হইয়াও সাকার শ্রীকৃষ্ণরূপে বিদ্যমান। ইনি প্রকৃত ভক্তগণের উপলব্ধির বিষয় হন এবং ইহাই পরব্রহ্মের সৈম্যক্ আবির্ভাব ও সৈম্যক্ উপলব্ধি।

শ্রীজীবমতে পরব্রহ্মের দ্বিতীয় আবির্ভাব পরমাত্মারূপে। পরমাত্মা যোগীগণের উপলব্ধির বিষয়, পরমাত্মাই সাক্ষাৎভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, এবং সকল জীবে ও জগতে অন্তর্যামী (Indwelling Controller) রূপে অবস্থিত। পরমাত্মাতে পরব্রহ্মের মায়াশক্তির প্রাচুর্য ও স্বরূপ শক্তির ন্যূনতা আছে। পরব্রহ্ম স্বরূপ শক্তির বলে সর্বব্যাপী ও অন্তর্যামী; এবং মায়া শক্তির প্রাচুর্য বশতঃ জীবজগতের স্রষ্টা ও সাক্ষাৎ সম্পর্কে সম্পর্কিত। শ্রীজীবমতে পরব্রহ্মের তৃতীয় আবির্ভাব নিঃশক্তিক ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে। এই পরব্রহ্ম জ্ঞানীগণের উপলব্ধির বিষয়। জ্ঞানীগণের নিকট নির্গুণ ও নিঃশক্তিক রূপে আবির্ভূত হইলেও বস্তুতঃ তিনি নিঃশক্তিক বা নির্গুণ নহেন, সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য পরব্রহ্মে প্রসুপ্ত থাকে মাত্র। জ্ঞানীদিগের নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধি শ্রীজীবমতে অসম্যক উপলব্ধি।

অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব। কারণ তাঁহার মধ্যে সকল ঐশ্বর্য ও সকল শক্তির প্রকাশ রহিয়াছে।

পরমাত্মা ভগবান্ হইতে ন্যূন আবির্ভাব, কারণ তাহাতে সকল শক্তি ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ নাই ; কিছু শক্তি ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ আছে।

পরব্রহ্ম বা ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আবির্ভাব, কেননা তাহাতে কোনো ঐশ্বর্যের বা শক্তির প্রকাশ নাই।

শ্রীরামানুজ ও শ্রীজীবের মতবাদের পার্থক্য তাঁহাদের নির্দিষ্ট সাধন পদ্ধতির মধ্যেও লক্ষিত হয়। শ্রীরামানুজ-মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর একজনই। তিনি অবশ্যই বৈকুণ্ঠশায়ী বিষ্ণু। তিনি "শেষী"; জীব—"শেষ।" তিনি আত্মা, জীব তাঁহার শরীর। তিনি প্রভু, জীব তাঁহার কিঙ্কর। ভক্তিরূপা জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে সেই উপাসনাই অপরোক্ষ ব্রহ্মোপলব্ধিতে পরিণত হইবে। এই জ্ঞানরূপ ভক্তি চরমে প্রপত্তিরূপা বা আত্মসমর্পণে পরিণত হয়। ইহা দ্বারাই জীব কর্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, অর্থাৎ দেহান্তে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট সামীপ্যাদি মুক্তিলাভ করে।

শ্রীজীব মতে পরমাত্মা বা ভগবানের প্রতি ভক্তিদ্বারাই জীবের সাযুজ্যাদি মুক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু এই সকল মুক্তি বা মোক্ষ পরমপুরুষার্থ হইলেও জীবের পরমতম পুরুষার্থ (Supreme Human End) নহে। ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীতিই পরমতম বা পঞ্চম পুরুষার্থ। অবশ্য এই প্রীতিলাভের জন্য প্রেমাস্পদের জ্ঞান আবশ্যক ; এই ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীতি ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীভগবানেরই স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব বিশেষ।

শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি নিহিত আছে,—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী অর্থাৎ সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ।

হ্লাদিনীর সারাংশ ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তি বা ভগবৎ প্রীতিরূপে আবির্ভূত হয়। এই ভক্তি বা ভগবৎ প্রীতি মোক্ষের সাধন বা উপায় হইলেও প্রকৃত ভক্ত মোক্ষ চাহে না। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের প্রীতিই তাহার চরম কাম্য। সুতরাং দেহান্তে সে না চাহিলেও নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে সামীপ্য মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার সেবা ও প্রীতিতে নিমগ্ন থাকে। অন্যবিধ মুক্তি অপেক্ষা সামীপ্য মুক্তি ভক্তের নিকট অধিক কাম্য, কেননা তাহাতে সেবা ও প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ভক্তি ও প্রীতির পথে চলিতে হইলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাবের যে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার উৎকর্ষের

দ্বারা তাহাকে রসে পরিণত করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি পরম প্রীতিলাভ করিতে হইবে।

এই প্রীতির নানা স্তর আছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসেবামাত্রই মমত্ববুদ্ধিময়, তবু এদের মধ্যে প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে তারতম্য আছে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ভাবের উৎকর্ষ। মধুর ভাবের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা পরম পুরুষার্থতা লাভের একমাত্র পথ বলে নির্দেশ করেছেন।

ভক্তিধর্মের প্রবর্তক আচার্যগণের অগ্রণী ছিলেন শ্রীরামানুজ। তাঁর "বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ" মতে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য। শ্রীরামানুজ প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের মধ্যে মধুর রসের উৎকর্ষ প্রচারিত হয় নাই।

শ্রীরামানুজের বহুপূর্বে যে আড়বারগণ দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের ভগবৎ-প্রীতি-সাধনা মধুর রস মিশ্রিত।

দাক্ষিণাত্যের আড়বারদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শঠকোপ বা নম্মাড়্বার।

তামিল্ ভাষায় রচিত "দ্রামিড়োপনিষদ" বা "দ্রাবিড়াম্নায়" নামে যে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে, তাতে শঠকোপ আড়বার রচিত অংশ "দ্রাবিড় সামবেদ" নামে প্রসিদ্ধ। তাতে প্রধান ভাবে যে যে বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে, তার একটি তালিকা একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির নাম "দ্রাবিড়োপনিষৎতাৎপর্যম্"। এই গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে—

"পুংস্ত্বং নিয়মা পুরুষোত্তমতা বিশিষ্টে
স্ত্রী প্রায়ভাবকথনাচ্চ পরোঽখিলস্য॥
পুংসাং চ রঞ্জক বপুর্গুণসত্ত্বয়াঽপি—
শৌরেস্তু শঠারিমুনেরোঽভূদ্ধি কামিনীত্বম্।"

অর্থাৎ "শাস্ত্রে অখিল বিশ্বেরই স্ত্রী স্বভাবতা আছে, ইহা কথিত আছে। এই কারণে সর্বস্বামী শ্রীভগবানই পুরুষোত্তম; সেই পুরুষোত্তমেই কেবল পুরুষত্ব আছে। এই প্রকার নিশ্চয় সেই শঠারি মুনির হইয়াছিল বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীভগবানের শরীর ও গুণরাশি স্ত্রীগণের ন্যায় পুরুষগণেরও মনকে অনুরক্ত করিয়া থাকে, এইজন্য অবশেষে তাহার নিজেরও কামিনীভাব আবির্ভূত হইয়াছিল।"

আচার্য রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন "বেদান্ত-

দেশিকাচার্য"। দ্রাবিড় সামবেদের তাৎপর্য সংক্ষেপে বোঝাবার জন্ম "তাৎপর্য রত্নাবলী" নামে একখানি সংস্কৃত কবিতাময় গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। বেদান্ত দেশিকাচার্য মাধবাচার্যের সমসাময়িক। "তাৎপর্য রত্নাবলী"র সপ্তদশ শ্লোকটি এইরকম :

"স্ব প্রাপ্যাসিদ্ধ কান্তিং সুঘটিতদয়িতং বিস্ফুরত্তুঙ্গমূর্ত্তিম্।
প্রীত্যুন্মেষাদিভোগ্যং নবঘন সুরসং নৈকভূষাদি চিত্রম্।
প্রখ্যাত প্রীতিশীলং দুরভিলপরসং সদ্গুণা মোদকন্তম্।
বিশ্বব্যাবৃত্তিচিত্রং ব্রজযুবতিগণ খ্যাতনীত্যাঽশ্বভুক্তং।"

অর্থাৎ "(সেই শঠারি) ব্রজযুবতীগণের প্রখ্যাত নীতি (উপাসনা মার্গ) অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানকে ভোগ করিয়াছিলেন। ভগবানের কান্তি লোক প্রসিদ্ধ না হইলেও তিনি কিন্তু তাহা নিজেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে করিতেন। ভগবানের আকার সুঘটিত সুতরাং প্রিয়। তাঁহার মূর্তি সমুন্নত ও দীপ্তিময়। প্রীতির উন্মেষ হইলেই তাঁহাকে ভোগ করতে পারা যায়। তিনি নবোদিত জলদের ন্যায় কমনীয়। তাঁহার অঙ্গে নানা প্রকার ভূষণাদি আছে বলিয়া তিনি বড়ই বিস্ময়াবহ। তাঁহার প্রীতি ও শীলভুবনে প্রখ্যাত। তিনি রসস্বরূপ, অথচ সে রসের স্বরূপ কি, তাহা বাক্যের অগোচর। ভগবান্ বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ ও সকলেরই বিস্ময়জনক।"

এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে ব্রজ-ললনাদের ভগবৎ উপাসনার রীতি অর্থাৎ মধুর রসের সাধনায়ই শঠকোপ আড়বার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

"তাৎপর্য রত্নাবলী" গ্রন্থের উপসংহারে ১১৬তম শ্লোকে চারভাগে ভাগ করা শঠারি রচিত দ্রাবিড় সামবেদে কি কি বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে, তাও বলা হয়েছে—শ্লোকটি এই :

"আদ্যেস্বীয় প্রবন্ধে শঠজিদভিদধে সংসৃতের্দুঃসহত্বং
দ্বৈতীয়ীকে স্বরূপাদ্য অখিলমথ হরেরন্বভূৎ স্পষ্ট দৃষ্টম্।
তার্তীয়ীকে স্বকীয়াং ভগবদনুভবে ক্ষোরয়ামাস তীব্রা।
মাশাং তুর্যে যথেষ্টাং ভগবদনুভবাদপি মুক্তিং শঠারিঃ।"

অর্থাৎ—

"স্বরচিত প্রবন্ধের প্রথম ভাগে শঠারি সংসারের দুঃসহত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; দ্বিতীয় ভাগে শ্রীহরির স্বরূপ প্রভৃতি—যাহা তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন, তাহাই বুঝাইয়াছেন; তৃতীয় ভাগে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ

অনুভবের পর তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার তীব্র আশা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন ; চতুর্থ ভাগে তিনি শ্রীভগবানের অনুভব প্রভাবে প্রাপ্ত স্বীয় অভিমত মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে "পরা" বা "অহৈতুকী ভক্তি" ব'লে যে ভক্তির বর্ণনা করা হ'য়েছে, তার উৎস পরব্রহ্মের ভাবপ্রধান অনুভূতি জাত আত্মবিসর্জন ও সেবাপরতা। এই "অহৈতুকী ভক্তি"র মূর্ত বিগ্রহ ব্রজের গোপীগণ।

যদুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য, তত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ব্রজ-গোপীদের বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাতে। উদ্ধবের আশা ছিল তাঁর উপদেশে ব্রজগোপীদের কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হবে।

উদ্ধবের উপদেশের ফল কি হ'য়েছিল, ব্রজললনাগণ কি সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন, ভাগবত-রচয়িতা সে সম্বন্ধে নীরব। তবে কিংবদন্তী অনুসারে ব্রজললনারা ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্ধবকে লক্ষ্য ক'রে হাতের মোটা মোটা বালা ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এর নজীর একটা হিন্দী দেহাতী গানে মেলে—

বৈরাগ যোগ ! কঠিন উধো !
হম্ না করব হো !
ক্যায়সে তাজব এ্যায়সা দেশ !
জটা মটুক করব ভেশ !
অংবকুত লায়ে জহর
খায়ে মরব হো !
যমুনা-জল অত গভীর,
তন্ মন নাহি ধরত ধীর !
কৃষ্ণ-বিরহ অসহ পীড়
ডুবি মরব হো ॥

অর্থাৎ "ওহে উদ্ধব ! (উধো !) বৈরাগ্য যোগ কঠিন, আমরা অভ্যাস করতে পারব না। এই দেশ (বৃন্দাবন) কেমন ক'রে ত্যাগ করব, চূড়া বেঁধে কেমন ক'রে বেশ বানাব, তার চেয়ে বিষ এনে খেয়ে মরব। যমুনার জল খুবই গভীর, তনু মন সবই তাতে ডুবে যায়, কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করতে না পারলে যমুনায় ডুবে মরব।"

সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর ব্যর্থ হ'য়েছিল, বলাই বাহুল্য। উদ্ধব ব্রজললনাদের কিছুই বোঝাতে পারেন নি ; বরং তিনি নিজেই ব্রজগোপীদের কৃষ্ণ প্রেম ও ভক্তিতে এত মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলেন, যে সমুদ্র-সদৃশ গভীর অদ্বৈত-তত্ত্ব-জ্ঞানের সমস্ত কাঠিন্য ও দুর্লঙ্ঘ্যতা ভেদ ক'রে উদ্ধবের মুখ থেকে শ্লোক বেরিয়ে এসেছিল :

"আসামহং চরণরেণুজুষামহোস্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।"

(ভাগবত, দশমস্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়—১২ শ্লোক)

অর্থাৎ—

"মরণের পর ব্রজললনাদের চরণরেণু যাদের উপর পতিত হয়, বৃন্দাবনের এমন কোনো লতা গুল্ম হয়ে যেন জন্মগ্রহণ করি।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণবধর্ম খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম শতাব্দীতে শিষ্ট সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সুরু করেছিল। অধ্যাপক গোপীনাথ রাও-এর গবেষণায়—দাক্ষিণাত্যের আড়বার সম্প্রদায়ের আটজনই নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই শঠকোপ আড়বারের সময়ে দক্ষিণ ভারতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুশীলন অসম্ভব বলে মনে হয় না।

বাংলা মহাজন পদাবলীতে শ্রীমদ্‌ভাগবতবর্ণিত বৈষ্ণবভাবের চরম উৎকর্ষ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের মাধ্যমে প্রকাশিত হ'য়েছে, এবং শান্ত অপেক্ষা দাস্যের ; দাস্য অপেক্ষা সখ্যের ; সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের ; বাৎসল্যের অপেক্ষা মধুরের উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে।

দাক্ষিণাত্যের আড়বার সম্প্রদায় রচিত পদাবলীতে স্তর হিসাবে এই পঞ্চরসের পরিকল্পনা এবং পর্যায়ক্রমে এই সব রসের উৎকর্ষ বিচার লক্ষিত হয় না তবে শান্ত, দাস্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারভাবে গভীর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। বাংলা মহাজন পদাবলীর সঙ্গে তুলনায় আড়বার পদাবলীতে সখ্য ভাবের পদের অভাব লক্ষণীয়, এবং বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, মধুর ভাবের মধ্যেও ঐশ্বর্য ভাবের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ বাংলা মহাজন পদাবলীতে প্রকাশিত রসের ন্যায় আড়বার-গীতিতে প্রকাশিত রস গোপীভাব প্রধান হলেও অসমোর্দ্ধ মাধুর্যের পদানত নয়।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে "গোষ্ঠকালীন বিরহ" বাৎসল্যের অন্তর্গত এবং এই পর্যায়ে মাতা যশোমতীর ব্যাকুলতা ও শ্রীমতীর বিরহ-আর্তি-

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি বা ভক্তির প্রকাশ হিসাবে মূলতঃ একই ; তবে এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রীমতীর বিরহ আর্তির মধ্যে প্রেমের প্রগাঢ়তা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে।

দাক্ষিণাত্যের আড়বার-গীতিতে শঠকোপের রচিত পদাবলীতে "গোষ্ঠ-কালীন বিরহ" বাৎসল্যের অন্তর্গত নয় ; এবং এই পর্য্যায়ের পদগুলিতে শ্রীমতীর "বিরহ-আর্ত্তি"ই প্রকাশ পেয়েছে।

উদাহরণের সাহায্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর এই পর্য্যায়ের পদগুলির সঙ্গে শঠকোপের রচিত পদগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এই সমালোচনায় উদ্ধৃত মূল তামিল পদগুলির বাংলা অনুবাদ আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস কৃত, এবং এ'গুলি তাঁর রচিত "সহস্র গীতি" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হ'য়েছে। "সহস্র গীতি" আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস বিরচিত শঠকোপ আড়বার রচিত সম্পূর্ণ "তিরুবায়মোড়ি"র অনুবাদ গ্রন্থ।

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—দশম শতক, তৃতীয় দশক

প্রথম গাথা। রাগ—খাম্বোজী, তাল—আদি

বেয়্‌মরু তোলিণৈ মেলিয়ু মালো !
মেলিবুমেন্‌ দানিমৈয়ম্‌ যাদুম্‌ নোক্কাক্‌
কামরু কুয়িল্‌কলুঙ্‌ গূবু মালো !
কণমযি লবৈকলন্‌ দালু মালো !
আমরু বিমনিরৈ মেয়্‌ক্ক নীপোক্‌
কোরুপক লায়ির মুডিয়ালো !
তামরৈক্‌ কণ্‌ কলকোণ ডীর্‌দিয়ালো !
তকবিলৈ তকবিলৈ য়েনী কন্না !

অনুবাদ—১০।৩।১

ভুজযুগ ভেল ক্ষীণ
অসহায় প্রতিদিন
তথাপি বিচারহীন পরভৃতগণ।
মিলিয়া কোকিলাসনে
উলসিত নিজ গানে
যুথে যুথে শিখিকুল করিছে নর্ত্তন॥

গোধন চরাতে যবে
গোঠে গিয়া বিহরিবে
সারাটি দিবস শতকল্প, সম গণি।
তোমার কমল আঁখি
দেয় ব্যথা করে দুখী
দয়া নাই নিরদয় তুমি কৃষ্ণমণি॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—দশম শতক, তৃতীয় দশক

তৃতীয় গাথা। রাগ—খাম্বোজী, তাল—আদি

বীরন্নিন্ পস্থনিরৈ মেয়্ক্কপ পোক্কু
বেব্ বুয়িরক কোণ্ডেন তাবি বেমাল্
যাবরুন্ তুণৈয়িল্লৈ য়ানি রুন্দুন্
নঞ্চন মেনিয়ৈ যাট্টিঙ্ গাণেন্
পোবত্তন রোরুপকল্ নীয় কনরাল
পোরুকয়র্ কণ্ণিনৈ নীরুম্ নিল্লা
সাবদিব্ বায়্কুলবং তায়্সসি য়োমায়্প্
পিরন্দবিৎ তডুব্বৈয়োম্ তনিমে তানে।

অনুবাদ—১০।৩।৩

যদি যাও গোচারণে সারাদিন অদর্শনে
ধরিতে নারিব প্রাণ কহিনু তোমায়।
বিরহ অনলে হায় প্রাণ মোর দহি যায়
খর বহে উষ্ণশ্বাস না দেখি সহায়॥
তব গতি মনোহর রূপ শ্যাম সুন্দর
না দেখি নয়নে হায়! গেলে গোচারণে—
ব্যাকুলিত এ' নয়নে বহে বারি অনুখণে
মরণ সমান গণি তব অদর্শনে।
না জানি কি কর্মফলে আসি এই গোপকুলে
অবলা গোপিনী হ'য়ে লভেছি জনম
তব দাসীগণ দীনা সদা তব পরাধীনা
অসহায় দশা গণি তা যে মৃত্যু সম॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—দশম শতক, তৃতীয় দশক

পঞ্চম গাথা। রাগ—খাম্বোজী, তাল—আদি

পণিমোড়ি নিনৈন্তোরু যাবি বেমাল্
পকল্‌নিরৈ মেয়্‌ক্কিয় পোয় কন্না!
পিণিয়বিড়্ মল্লিকৈ বাড়ৈ তূবপ্
পেরুমদ মালৈয়ুম্ বন্দিনরালো!
মণিমিকু মার্‌বিনিন্ মুল্লৈপ্ পোদেন্
বনমুলৈ কমড়্‌বিং তুনবায়ম্ দন্দন্দ্
অণিমিকু তামরৈক্ কৈয়ৈ অন্দো!
অড়িচ্চিয়োন্ দলৈমিসৈ নীয় নিয়ায়্।

অনুবাদ—১০।৩।৫

তোমার কপটবাণী অনল সমান গণি
দহে মোর সারা প্রাণ কি করি উপায়।
এবে যাবে গোচারণে ব্যথা দিতে মোর প্রাণে
পুষ্পগন্ধ বাহি বায়ু ধীরি বহি যায়॥
অকরুণা সন্ধ্যারাণী দেয় মোরে হাতছানি
আরো কত বৈরী আছে না যায় কহনে।
হেনকালে এ পাপিনী তোমার আশ্বাসবাণী
পায় যদি তবে ভাবি বাঁচিব পরাণে॥
তব মণি উরোপর যে যুথিকা মালাধর
তা দিয়া এ কুচযুগ কর সুশোভন।
কহিয়া অমিয় বাণী তব পদ্মকরখানি
দাসীর এ শির'পরি করহ ধারণ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—দশম শতক, তৃতীয় দশক

সপ্তম গাথা। রাগ—খাম্বোজী, তাল—আদি

বেমেম ছুয়িরড়ল্ মেড়্‌কি লুরু
বেলবলৈ মেকলৈ কন্‌ড়রু বীড়ং

তুমল্বুক্ কল্লিনৈ মুত্তঞ্চ চোরৎ
তূনৈমূলৈ পয়ন্দেন তোল্কল্ বাড
মামণি বণ্ণা ! বুন্সেঙ গমল
বণ্ণমেন্ মলরড়ি নোব নীপোয়
আয়কিড়্ন তুকন্দবৈ মেয়্কিন্ রুন্নো
ডাস্থরবুকল্ তলৈপ্পেয়্দিল্ যবনকোল্ আজে ?

অনুবাদ—১০।৩।৭

খসিছে মেখলাভার কণক বলয়া আর
ভাবি ভাবি প্রতি অঙ্গ ভেল অতি ক্ষীণ।
মোর দুটি আঁখিলোরে মুক্তা যেন ঝরি পড়ে
পয়োধর দিন দিন হতেছে মলিন॥
রাতুল কমল যেন মৃদু তব শ্রীচরণ
মরি কত পায় ব্যথা তৃণাঙ্কুর পথে।
শুন মোর নীলমণি গোঠে না যাইও তুমি
চরাইতে ধেনু নাহি দিব কোনমতে॥
তব গোচারণ কালে অসুরের নানা ছলে
প্রতিদিন তোমাসনে বাড়ায় বিবাদ।
সে বিবাদে বড় ভয় না জানি কবে কি হয়
পরাণ ত্যজিব যদি ঘটে পরমাদ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—দশম শতক, তৃতীয় দশক

দশম গাথা। রাগ খাম্বোজী, তাল—আদি

অবত্তঙ্গল বিলৈয়ুমেন্ সোর্কো লন্দো।
অসুরবুকল্ বল্কৈয়র কঞ্চ নেব
তবত্তবর্ মরুকানন্ কড়িত রুনব্
তনিমৈয়ুম্ পেরিদুনক্ কিরাম নৈয়ুম্
উবর্ত্তলৈ মুডন্দিরি কিলৈয়্ মেন্রেন্
রুণ্ড্র বেয়্দৈ য়াবি বে মাল্

তিবত্তিলুম্ পল্লনিরৈ মেয়্প্পু উকত্তি
সেঙ্গনি বায়েঙ্গ নায়র্ দেবে !

অনুবাদ—১০।৩।১০

প্রবল অসুরগণ হিংসক কংসের জন
বনে সাধুগণে হিংসা করিয়া বেড়ায়।
বলরাম সঙ্গ ছাড়ি একাকী চরাও ফিরি
এত ভাবি প্রাণমন দহিতেছে হায় ॥
বনে তব গোচারণ বাসে ভালো দেবগণ
অনুদিন আসি তথা করে দরশন।
হে মোহন রূপধর হে গোপদেবতা মোর
গোঠে আর না যাইও রাখহ বচন।

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—দশম শতক, তৃতীয় দশক

একাদশ গাথা। রাগ—খাম্বোজী, তাল—আদি

সেঙ্গনি বায়েঙ্গ নায়র্ তেবুং
তিরুবড়ি তিরুবড়ি মেল্ পোরুনল্
সঙ্গনি তুবৈবনবণ্ তেনকু রুকূর্
বণ্সড গোপনসোল্ নায়িরত্তুল্
বক্কৈয় রায়্চ্চিয় বায়্ন্দ মালৈ
অবনোড়ুম্ পিরিবদর্ কিরক্কিং তৈয়ল্
অঙ্গবন্ পল্লনিরৈ—মেয়্প্পো ডিপ্পা
মুরৈত্তন বিবৈয়ুম্পং তবত্তিন্ সারবে ॥

অনুবাদ—১০।৩।১১

গোপী প্রেম নিদর্শন এই দশ গাথা !
গোপীভাবে অনুগত করয়ে সর্বথা ॥

বাংলা মহাজন পদাবলী—(বাৎসল্যং—গোষ্ঠ)

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—১৪।১১১০

রাগ—ধানশী

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর ॥
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধচূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সবাই দাড়াঞা রাজপথে ॥
বিশাল অর্জুন আন রুক্মিনী অংশমান
সাজিয়া সবাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লুটায় ॥
চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

পদ সংখ্যা—১৫।১১১১

রাগ—সুহই

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে ॥
দধি মন্থনকালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে নারি ॥

গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি
নয়ন নিমিষে হই হারা॥
গোপাল আমার পরাণ পুতলী।
তোমারে সোঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি॥

পদ সংখ্যা—১৮।১১৭৪

রাগ—মায়ুর

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দু নয়নে
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী॥
অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাইতে বনে দেখিয়া সে মুখ পানে
শিশুগণে করয়ে মিনতি॥
স্তনক্ষীরে, আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদগদ কহে আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥

পদ সংখ্যা—২১।১১৭৭

রাগ—মঙ্গল

বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া, প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দু'খানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করু দেবগণ।

কটিতট সুজঠর রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলী রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠদেশ হয় গ্রীব
অধঊর্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দনে
দশ দিকে দশ দিক পাল।
যত শত্রু হও মিত্র রক্ষা করু সব মিত্র
নহে তুমি হও তার কাল ॥
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময়
বলরাম হাতে সমর্পিল ॥

পদ সংখ্যা—৩।১২১২

রাগ—সিন্ধুড়া

শ্রীদাম সুদাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করতো সভারে।
বন কত অতি দূর নবতৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইও দূর ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিও গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো মা ব'লে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপ জাতি, গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ॥

বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

পদ সংখ্যা—৪।১১৮৪

শ্রীরাগ

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহু ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা-পায়॥

আড়বারদের মধ্যে বাৎসল্যরসের কবি হিসাবে পেরিয়ালোয়ারের খ্যাতিই সর্বাধিক।

কুলশেখরও বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছিলেন। উদাহরণ—

তামিল মূল—

পেরিয়ালোয়ার তিরুমোড়ি (১।৪।১—২)

"তন্‌মুখত্তুচ্চুট্টি—তুঙ্গত্ তুঙ্গত্ তবলন্দু পোয়"

অর্থ—"বালগোপাল ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে ; বারে বারে দুলিতেছে তাহার কপালের টিকলি। তাহার সোনার কটি-ভূষণে রুমুঝুমু শব্দ হইতেছে। হে চাঁদ, যদি তোমার চোখ থাকে, তবে আমার বাল গোবিন্দের ক্রীড়া দেখিয়া যাও।

আমার ছোট্ট বাছা প্রাণ, আমার কাছে সে অনুপম অমৃত ; সে তাহার ছোট ছোট হাত তুলিয়া আমাকে ডাকিতেছে। হে চাঁদ, যদি তুমি এই বালকৃষ্ণের সহিত খেলিতে ইচ্ছা কর, তবে মেঘের মধ্যে লুকাইও না, সানন্দে চলিয়া আইস।"

(অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য, পৃঃ ১০৭—১০৮)

কুলশেখর—তামিল মূল

মুলুত্তুম বেণ্ণেয় অলৈন্ তুতোট্টউণ্ডুম্
মুকিল্ ইলম্ চিরুত্ তামরৈক্ কৈয়ুম্,
এলিল্ কোল্ তাম্বু কোণ্ডু অডিপ্ পদর্কু এল্কুম্
নিলৈয়ুম্ বেণ্ তয়ির্ তোয়নদ চেব্বায়ুম্
অলুকৈয়ুম্ অঞ্জিনোক্কুম অন্ নোক্কুম
অণিকোল্ চেম্ চিরুবায় নেলিপ্ পত্তুম্
তোলুকৈয়ুম্, ইবে কণ্ড অশোদৈ
তোল্লৈ ইন্বত্তু ইরুদি কণ্ডালে।

অনুবাদ—"শিশুকৃষ্ণ হাত দিয়া মাখন স্পর্শ করিয়া তাহার আস্বাদ লইতেছে। পদ্মের মত কোমল তাহার ছোট হাত দু'খানি ঈষৎ বোজা। সুন্দর একগাছি দড়ি লইয়া মা তাহাকে মারিতে আসিতেছে বলিয়া তাহার একটু একটু ভয় ভয় ভাব ; কৃষ্ণের লাল মুখখানি দই দিয়া একেবারে মাখা-জোখা হইয়া আছে। তাহার সন্ত্রস্ত চোখে সুন্দর দৃষ্টি ; তাহার লাল মুখের সুন্দর কম্পন এবং তাহার প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড়-করা হাত—এই সমস্ত দেখিয়া মা যশোদা যে আনন্দ লাভ করিল, তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই।"

—(বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য—১০৬—১০৭ পৃঃ)

আড়্বার পদাবলীতে "সখ্যের" পদ একেবারেই নাই ; "মানের পদ" থাকলেও "মানভঞ্জনের" পদ নাই। শঠকোপের "তিরুবায়মোড়ি"তে—ষষ্ঠশতক দ্বিতীয় দশকে ৭টি মানের ও একটি "কলহান্তরিতা"র পদ আছে। এইগুলির মধ্যে থেকে তুলনামূলক উদাহরণ দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—৩।৪২৮

রাগ সুহই

মাধব ! কাহে কান্দায়সি হামে !
চলি যাহ সো ধনী ঠামে ॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী ।
তাকর চরণ যাই সেবি ॥
সো যাবক তুয়া অঙ্গ ।
ততহি করই পুন রঙ্গ ॥
সোই পূরব তুয়া কাম ।
কি ফল মুগধিনী ঠাম ॥
এত কহি গদ গদ ভাষ ।
ভণ রাধামোহন দাস ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মেড়ি—ষষ্ঠ শতক, দ্বিতীয় দশক

ষষ্ঠ গাথা। রাগ—করুণ বড়াড়ী, তাল—আদি

কুডকি এঙ্গল্ কুড়ম পন্কোণ্ডু কোয়িন্মৈ
সৈয়্দু কণম্ মোন্রিল্লৈ
পড়কি য়ামিরুপ্ পোমবর
মে ? য়িৎ তিরু বরুল্কল্ ?
আড়কি য়ারিব্ বুলক মুন্রুকুম্ দেবি
মৈদকু বার় পলরুলব্
কড়ক মেরেল্ নম্বী !
উনক্ কুমিলৈ দেকন্মমে ।

অনুবাদ—৬।২।৬

মোরে বাক্যে তুষ্ট করি ক্রীড়া পুত্তলিকা হরি'
কিবা ফলোদয় ? জানি তোমা বারে বার ।
তব এত কৃপাভারে না পারি যে সহিবারে
অনুচিত আচরণ কর পরিহার ॥

রূপে-গুণে অনুপমা আছে বহু প্রিয়তমা
মহিষী তোমার যোগ্যা সেথা যাও চলি।
আমরা অযোগ্য আর তুমি পূর্ণ গুণাধার
এ সভায় পশিও না সার কথা বলি॥

কলহান্তরিতা

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—২।৪৩।২

রাগ—সুহই

আকুল প্রেম পহিল ন জানলু
সো বহু বল্লভ কান
আদর সাধে বাদ করি তা সঙ্গে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি! তোহে কহু মরমকদাহ।
কানুক রোখে যো ধনী রোখই
সোই তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপোখি।
যো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরয লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই সতি ভামিনী
ঐছন কানুক লেহ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—প্রথম শতক, পঞ্চম দশক

প্রথম গাথা। রাগ—অপরূপ, তাল—আদি

বলবে ডুলকিন্ মুদলায়
বানোরিয়ৈয়ে অরুবিনৈয়েন্

কলবেড় বেন্নেয় তোড়ুবুণ্ড
কল্‌বা ! বেন্‌পন্‌ পিন্নৈয়ুম্‌
তলবেড় মুরুবয়্‌ পিন্নৈকায়্‌
যল্লা নায়র্‌ তলৈবনায়্‌
ইলবে বেড়ুম্‌ তড়ুবিয়্‌
এন্দায় ! এন্‌পন্‌ নিনৈন্দুনৈন্দে ॥
উভয় বিভূতিপতি অবতারকন্দ ।

অনুবাদ—১।৫।১

তারে আমি কত দোষে
ছুবিয়াছি অন্ধ ॥
গালি দিয়ে বলিয়াছি—
রে কপট ননীচোর ।
লীলা লাগি গোপ হ'য়ে
প্রণয়ে হইয়ে ভোর ॥
ক্রূর মহাপাপী আমি
অকাজ করিনু হায় ।
ভাবি ভাবি কায় মন
শিথিল হইয়া যায় ॥

আড়্‌বার পদাবলীতে "পূর্বরাগের" পদ আলাদা করে পাওয়া যায় না, তবে শ্রীরাধিকার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় এবং মাতার উক্তিতে "বিরহিণার" দশা বর্ণনায় এমন পদ আছে যেগুলির সঙ্গে "মহাজন" পদাবলীর "পূর্বরাগে"র এবং "বিরহ দশা"র পদের মিল আছে।

উদাহরণ—

পূর্বরাগ

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—৪।২৬৯।

শ্রীরাগ

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা ।

মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশিদিশি শশী ষোলকলা ॥
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥ ধ্রু ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ নখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে।
কুল শীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেইরূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন নাগশে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—সপ্তম শতক, সপ্তম দশক

অষ্টম গাথা। রাগ মুকারি, তাল অড

কোলিড়ৈং তামরৈ য়ুম্ কোডি
য়ুম্বল মুম্ বিল্লুম্
কোলিড়ৈং তণমুত্ত মুন্দলি
কুঙ্গুলির্ বান্পিরৈয়ুম্
কোলিড়ৈ যাবুডৈ য়কোড়ুঞ্
চোদিবট্ টঙ্গোল্ ? কন্নন্
কোলিড়ৈ রাণ্মুক মায়্ক্কোডি
য়েন্নুয়ির্ কোল্কিন্রদে।

অনুবাদ—৭।৭।৮

নয়নকমল নাসালতা ভুরু
প্রবাল অধর তায়।
গাঁথিয়া ধবল দশন মুকুতা
শ্রবণ পল্লব ভায় ॥

শশীকলা সম ললাট ফলক
শোভিতেছে তদুপরে।
লাবণি উজল সুন্দর মুখ
মণ্ডলখানি ভরে॥
অতীব উজল কৃষ্ণমূরতি
লাবণির ধারা বয়।
মোহন সে রূপ পাপিনী আমার
প্রাণটি কাড়িয়া লয়॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—সপ্তম শতক, সপ্তম দশক

দশম গাথা। রাগ—মুকারি, তাল—অত

নিত্তিমুৎ তত্তুলেন রুনেরিং
তকৈয় রায়্ এন্নৈনীর্
সুত্তিয়ুএঞ্ চুড়ন্দুম্বৈ তির্সুডর্স্
সোদি মণিনিরমায়্
মুত্তবিম্ মুবুল্ কুম্বিরি
কিন্র সুডর্মডিক্কে
ওত্তুমৈক্ কোণ্ডুল্ লম্মন্নে
মীর্! নসৈ য়েন্নুড়কে॥

অনুবাদ—৭।৭।১০

দেখিয়া আমারে বহিরঙ্গনে
সকলে ঘিরিয়া মাগো।
তাড়নে ভৎ‍র্সনে কিবা ফলোদয়
ঘুমায়োনো জাগো! জাগো॥
ত্রিলোক ব্যাপ্ত দীপ্তমণির সে
মোহন কিরীটে তারি।
বিকায়েছে মন ত্যজ মোর আশা
আর না রহিতে পারি॥

পূর্ব্বরাগ

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—১৫০

সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর
আর তাহে কুটিল কটাখি।
হেরইতে হা মারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরয শাখি।
এ সখি বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত বসন জনু বিজুরি বিরাজিত
সজল জলদ রুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু ভাষ হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ আগি।
যাকর ধূমে ধরম পথ কুলবতী
হেরই রহু পুর ভাগি॥
তাঁহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন
অন অন হৃদয়ক মাঝ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—প্রথম শতক, চতুর্থ দশক

দ্বিতীয় গাথা। রাগ—কণ্ডা, তাল—আদি

এন সেয়্য তামরৈক্কণ
পেরুমানার্ক কেন দূদায়
এন্ সেয়্যুম্ ? উরৈত্তক্কা
লিনকুয়িল্হাল্, নীরলিরে ?
মুন্ সেয়্দ মু ভ্রুবিনৈয়াল্
তিরুবড়িক্কীড়্ক কুত্তেবল্—
মূন্ সেয়্য মুয়লাদে
অহল্বহু বো ? বিদিয়িনমে॥

অনুবাদ—১।৪।২

অরুণ নয়ন কোণে চেয়ে ছিল মোর পানে
গেলা চলি সে পরাণ নিয়া।
সেই হ'তে নিশিদিন ভাবি ভাবি তনু ক্ষীণ
হে সখি কোকিলা কহ গিয়া॥
যদি বল পক্ষীজাতি শক্তি হীনা তুচ্ছ অতি
তার কাছে ভাষা না স্ফুরিবে।
কোয়ো তারে এ পাপিনী পদসেবাকাঙ্ক্ষিনী
সে আসিলে বাসনা পূরিবে॥

পূর্ব্বরাগ

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—৩০

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী
দেখয়ে খসায়ে চুলী।
হসতি বদনে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠে করি ময়ুর ময়ুরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—সপ্তম শতক, দ্বিতীয় দশক

পঞ্চম গাথা। রাগ—নীলাম্বুরী, তাল—আদি

সিন্দিক্কুন্ দিসৈক্কুম্ তেরুকৈ কুপ্পুন্
দিবরঙ্ গণ্ডুন্নো যেন্নুম্
বন্দিক্কুম্ আঙ্গে মড়েক্কণ নীর্ মল্‌ক
বন্দিডা যেন্‌রেন্‌রে ময়ঙ্গুম্
অন্দিপ্পো দবুণ্ নডুবিডন্ দানে !
অলৈক্কডল্ কড়েন্দ বারমুদে !
সন্দিত্তুন্ চরণঙ্ চার্বদে বলিত্ত
দৈয়লৈ মৈয়ল্ সেয়্দানে।

অনুবাদ—৭।২।৫

কভু চিন্তা মোহ কভু   কভু হর্ষভাব প্রভু
করজোড়ে রহে কভু অনিমেষ পারা।
শ্রীরঙ্গবাসিন্ হরে !   কহি কত স্তুতি করে
নেত্রজল বহে যেন বরষার ধারা॥
দেখা দাও বলি পুনঃ   মুরছয়ে ঘন ঘন
সন্ধ্যায় হিরণ্যভেদী ওহে ভগবান !
সুধালোভী দেবগণে   তোয সিন্ধু বিমথনে
তব পদ লোভী সুতা দুঃখে নিমগণ॥

বিরহ

পদমঞ্জরী

পদ সংখ্যা—২২৩

অতি শীতল   মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখী   হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা॥
কোকিলকুল   কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্কারে কুসুমে !

হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে ॥
সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি নামে।
যইখনে শুনে তইখনে উঠে
নব রাগিণী গানে ॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া ॥
শশিশেখরে কহে গোচরে
যাওত জীউ ফাটিয়া ॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—প্রথম শতক, চতুর্থ দশক

সপ্তম গাথা। রাগ—কণ্ডা, তাল—আদি

এন্‌পিড়ৈ কোপ্‌ পড়ুপোলপ
পনিবাড়ৈ য়িব্‌ কিন্‌র
দেন্‌পিড়ৈয়ে নিনৈন্দরুলি
য়রুলাদ তিরুমালার্ক
কেন্‌ পিড়ৈত্তাল্‌ তিরুরড়িয়িন্‌
তকবিল্লকেন্‌ রোরুবায়্‌সাল্‌
এন্‌ পিড়ৈক্ক মিলঙ্গিলিয়ে!
য়ান্‌বলর্দ নীয়লৈয়ে ?

অনুবাদ—১।৪।৭

বিরহে তাহার অস্থি চর্ম সার
কি কহব কত বেদনা।
হোলো বিষানল অতীব শীতল
মলয় অনিল বহনা ॥
অপরাধী বলে দয়া না করিলে,
দয়নীয়া পাবে কেমনে ?
হে পালিত শুক কহ মোর দুঃখ
বঁধুরে মধুর বচনে ॥

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পদ সংখ্যা—১৯২৮

শকতি হীন অতি উঠই না পারই
কাতরে সখিমুখ চাই।
পরশি ললাট করে মুখ ঝাঁপল
পদুমিনি হিমকর ধাই॥
মাধব! করুণা কি লব তোহে নাই।
একেবেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥
রাই উপেখি ধরণি পর লুঠই কত কত সারঙ্গ নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি বোয়ত জিবইতে সংশয় জানি॥
এত দিনে নবমি দশা পরিপূরল শ্বাস বহই ঊধ মন্দ।
মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত॥

তামিল মূল

তিরুবায়মোড়ি—সপ্তম শতক, দ্বিতীয় দশক

চতুর্থ গাথা। রাগ—নীলাম্বুরী, তাল—আদি

ইট্টকা লিট্ট কৈয়লা স্রিরুক্কু
মেট্টুন্দুলায় মরুলৈ কৃপ্পম্
কট্টমে কাদ লেন্‌রুমূচ্ চিরুণ্ডু
লডল্‌বন্ন! কডিয়ৈকা পেন্নম্
বট্টবায় নেমি বলবৈয়া! য়েন্নম্
বন্দিডা য়েন্‌রেন্‌রে মরুকুম্
সিট্টনে! সেড়ুনীরং তিরুবরঙ গত্তায়!
ইবল্ তিরত্তেন্ সিন্দিৎ তায়ে?

বিরহ

অনুবাদ—৭।২।৪

না চলে চরণ কর বিরহেতে জরজর
উঠিয়া চলিতে যায় পড়ে মূরছিয়া।

কৃতাঞ্জলি পুটে কয় প্রেমে এত দুঃখ হায়।
সাগর বরণ তব নিরদয় হিয়া ॥
কোথা চক্রপাণি মম এসো এসো প্রিয়তম
এত বলি মূরছিয়া হারায় চেতনা
শ্রীরজনিবাসী পতি মোর এ দুহিতা প্রতি
কিবা প্রতিকার তুমি করিছ ভাবনা ?

॥ ৩ ॥

দাক্ষিণাত্যের অড়্‌বার গীতি ও বাংলার মহাজন পদাবলীর সঙ্গীতাংশ বিচার করলে দেখা যাবে উভয়ই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। রাগ বা তালের নাম বিভিন্ন হলেও রাগ-রূপ বা তালের মাত্রা হিসাব বিচার করলেই বোঝা যায় যে উভয়ই উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির অনুসারী।

তবে এই সাদৃশ্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য বর্তমান।

দাক্ষিণাত্যের আড়্‌বার-গীতি "ভজন" বা "গীতের" ন্যায় একক সঙ্গীত। মন্দিরের মধ্যে দেবোপাসনার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে যদিও এই সব গীতি একাধিক কণ্ঠে মিলিতভাবে গান করা হয়, তবুও এদের মধ্যে জন-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

বাংলা মহাজন পদাবলী প্রারম্ভে একক সঙ্গীত হিসাবে রচিত হ'লেও "খেতুরি"-র মহোৎসবে পদাবলী কীর্তনকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ ক'রে। "কীর্তন"কে খাটি "জন সঙ্গীতে" পরিণত করবার পরিণত করবার চেষ্টা হ'য়েছিল।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর "কীর্তন" গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন :

মনে রাখিতে হইবে জন-সংগীত বা "Mass Song"-এর দৃষ্টান্ত ভারতীয় সংগীতে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। বিলাতের ধর্ম-মন্দিরে জন-সংগীতে সর্বসাধারণের যোগদান করিবার যে সুযোগ আছে নাম সংকীর্তনে সেইরূপ ব্যাপক একতা দেখা যায়।

খেতুরির মহোৎসবে নরোত্তমদাস ঠাকুর যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, তা অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সঙ্গীতের দ্বারা কীর্তনের আরম্ভ। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ-ভাবে শাস্ত্রীয়। "সংগীত রত্নাকরে"—অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সঙ্গীতের সংজ্ঞা অনুসারে —গীত "অনিবদ্ধ" ও "নিবদ্ধ" দুই প্রকার। "আলপ্তি" বা আলাপে রাগের

আলাপনমাত্র হয়, অর্থযুক্ত কথা দ্বারা ইহা আবদ্ধ নয়। নিরর্থক হুঙ্কার মাত্র স, ঋ, গ, ম বা আতানারি প্রভৃতির দ্বারা যে আলাপচারি হয় তাহার নাম "অনিবদ্ধ" সঙ্গীত। ইহা তালেরও অপেক্ষা রাখে না।

ধাতু এবং অঙ্গের দ্বারা আলাপ সার্থক বা অর্থযুক্ত পদ হলে তাহাকে "নিবদ্ধ-সংগীত" বলা যায়।

খেতুরির মহোৎসবের গায়কগণ সকলেই নরোত্তম ঠাকুরের পরিবারভুক্ত ছিলেন। প্রথমে গোকুলানন্দ অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করেন, অর্থাৎ শুধু "বর্ণন্যাস স্বরালাপে" কীর্তন গানের সূচনা করা হ'ল। তারপর নরোত্তম দাস ঠাকুর "নিবদ্ধ" গীতের পরিপাটী প্রচার করলেন।

খেতুরির মহোৎসবে কীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তিত হল, তাতে যে অনিবদ্ধ বা আলাপচারীর দ্বারা গীত আরম্ভ করা হয়েছিল, তার আভাস এখন কীর্তনের "মেল" বা "মেল জমাটে" পাওয়া যায় অর্থাৎ কীর্তনের প্রারম্ভে পরস্পরের কণ্ঠ মিলিয়ে সুরের "জমাট" করে গান ধরা হয়।

কীর্তনের "মেল" বা "মেল জমাটের" মধ্যেই কীর্তনের পরিচয় নিহিত আছে, শাস্ত্রায় সঙ্গীত হিসাবে। আর কীর্তনকে যে, জন সঙ্গীতে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল, তার পরিচয় রয়েছে আখর যোজনায় এবং তালফের্তায়। কীর্তনের আখর যোজনার পদ্ধতি ও তালফের্তার বৈশিষ্ট্য দুইই আরোপিত হয় খেতুরির মহোৎসবে।

পদাবলীর অর্থ সাধারণের বোধগম্য করবার জন্য আখর যোজনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। পদাবলীর কঠিন ভাষা সরল করে এবং তার অর্থ বিস্তৃত ক'রে আখর রচিত হয়, যাতে অনেকে এক সঙ্গে সেই আখর পুনরাবৃত্তি করে গান করতে পারে।

দেখা যায় এই পুনরাবৃত্তি ভাবাবেশ সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কীর্তনের তালফের্তার সৃষ্টিও এই একই উদ্দেশ্যে।

ভাবাবেশে মহাপ্রভু কীর্তনের সঙ্গে যে নৃত্য করতেন, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কীর্তনের নতুন তালের সৃষ্টি হয়।

সেই জন্যই দেখা যায় কীর্তনের সুর হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ রূপের অনুসারী হ'লেও কীর্তনের তাল তা নয়। হরিনাম বার বার উচ্চারণ ক'রে দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ের আবেশ সৃষ্টি করার সহায়তা করবার জন্যই খোলের

বোলের মাত্রা হিসাব নতুন করে করতে হ'য়েছিল। সেই জন্তই কীর্তনের তাল এই হিসাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তাল অনুসারী নয়।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাংলা মহাজন পদাবলীর মধ্যে যে কৃষ্ণ প্রেম প্রচারিত হয়েছিল সেই প্রেমে সর্বসাধারণকে মাতিয়ে তুলবার জন্তই খেতুরির উৎসবে নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ ক'রে কীর্তনকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল।

ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণ প্রেম বা ভগবৎভক্তি যাতে সর্বসাধারণের লভ্য হয়, তারই জন্ম সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার কীর্তন।

বাংলা পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের আড়্‌বার গীতির গভীর ও প্রধান পার্থক্য এই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বল্লভাচার্য ও সম্প্রদায় ও রাজস্থানের বৈষ্ণবধর্ম

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যকুলের মধ্যে বল্লভাচার্যের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

গোদাবরী নদীর দক্ষিণ উপকূলে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কাঙ্করবাদ গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক তেলেগু ব্রাহ্মণ বংশে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। বল্লভাচার্যের পারিবারিক পেশা ছিল পৌরহিত্য, এবং বংশের সাত পুরুষের মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে পুস্তক রচনা করেছিলেন।

এই বংশের যজ্ঞনারায়ণ ভট্ট নামধারী কোনো ব্রাহ্মণ এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর গভীর ভক্তির পুরস্কার পান স্বয়ং ভগবানের প্রতিশ্রুতিতে, যে তিনি যজ্ঞনারায়ণের বংশে আবির্ভূত হবেন। বল্লভাচার্যের অপর এক পূর্বপুরুষ, গণপতি ভট্ট তান্ত্রিকতা প্রচারের বিরোধিতা করে একখানি পুস্তক রচনা করেন, সর্ব তন্ত্র নিগ্রহ।

গণপতি ভট্টের পুত্র বালম ভট্ট ধর্ম বিষয়ে কতগুলি পুস্তক রচনা করেন, এই পুস্তকগুলির মধ্যে ভক্তি দীপ উল্লেখযোগ্য।

বালমভট্টের দুই পুত্র, লক্ষ্মণ ভট্ট এবং জনার্দন ভট্টের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজ পুরোহিত সুশর্মার কন্যা ইল্লামাগারুর পরিণয় হয়। এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম নেবার পরই লক্ষ্মণ ভট্ট গৃহত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ ভট্টের উদ্দেশ্য ছিল গুরু অন্বেষণ ও তীর্থযাত্রা। কিছুকালের মধ্যে লক্ষ্মণ ভট্ট প্রেমকর নামে একজন মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসীর কৃপালাভ করেন এবং সমস্ত জীবন তাঁর সেবায় উৎসর্গ করেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণের পিতা ও বধূ পুত্র কন্যাসহ তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে তাঁরা প্রেমকরের আবাসস্থলে এসে উপস্থিত হন। ইল্লামাগারুর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে এবং তার দুঃখ দুর্দশায় বিচলিত হয়ে প্রেমকর লক্ষ্মণ ভট্টকে গৃহে ফিরে যাবার আদেশ দেন।

এর কিছুদিন পরেই লক্ষ্মণ ভট্ট পরিবার সহ পূর্ব ভারতের কতকগুলি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হন এবং এইখানে তাঁর সঙ্গে চম্পারণ্য রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, কৃষ্ণদাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। কৃষ্ণদাস অপুত্রক ছিলেন, এবং লক্ষ্মণ ভট্টকে সাধু জেনে তাঁর নিকট পুত্র জন্মের আশীর্বাদ প্রার্থনা

করেন। লক্ষ্মণ ভট্টের আশীর্বাদে কৃষ্ণদাসের পুত্র হয় এবং পরবর্তী যুগে বল্লভাচার্যের ধর্ম প্রচারের আন্দোলনে কৃষ্ণদাসের পুত্র কিছু অংশ গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণ ভট্ট প্রয়াগ থেকে বারাণসী যান এবং সেইখানে কিছুকাল বাস করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মণ ভট্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাস করেন এবং নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মণ ভট্টের বাসকালে গুজব শোনা যায় যে বারাণসীতে মুসলমান আক্রমণ আসন্ন। এই সময়ে দুই মুসলমান রাজা দিল্লীর বহলুল লোদী এবং জৌনপুরের শর্কীর হুসেন শাহের যুদ্ধ চলছিল। হুসেন শাহের রাজ্যের রাজধানী ছিল বারাণসী থেকে মাত্র ছত্রিশ মাইল দূরে। ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটা গুজব রটে, যে হয় বহলুল লোদী স্বয়ং কিংবা তাঁর সেনাপতি বারাণসীর ধন সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি লুণ্ঠনের আক্রমণ চালাবে। মুসলমান আক্রমণের গুজবে অনেকেই ভয় পেয়ে বারাণসী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে সুরু করেন। যাঁরা দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে রওয়ানা হন, লক্ষ্মণ ভট্ট স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ তাঁদের সঙ্গী হন। ইল্লামা তখন সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা।

পথচলার পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী হওয়াতে আটমাসেই ইল্লামা একটি মৃতকল্প অপুষ্ট শিশু প্রসব করেন এবং এই শিশুই বল্লভাচার্য নামে খ্যাত হন। নিবিড় চম্পা অরণ্যের মধ্যে ১৫৩৫ সংবৎ ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখের একাদশ দিনে কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকারের মধ্যে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। জন্মাবার পর শিশুর দেহে প্রাণের সাড়া না পাওয়ায় মৃত ভেবে একটুকরো কাপড় জড়িয়ে একটা শমীবৃক্ষের কোটরে শিশুটিকে শুইয়ে রেখে লক্ষ্মণ ভট্ট চলে যান সমস্যাভাবে তাকে মাটির মধ্যে প্রোথিত না করে। যে চম্পা অরণ্যের মধ্যে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়, সেই অরণ্যটি মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের চম্পারণ্য নগরের খুব সন্নিকট, এবং এই অরণ্য সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে যে যদি কোনো গর্ভবতী রমণী এই অরণ্য অতিক্রম করতে চেষ্টা করে, তবে তার গর্ভপাত হবে।

চম্পারণ্য অতিক্রম করে চম্পারণ্য নগর থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মণ ভট্ট পরবর্তী বিশ্রামস্থান চৌড়ানগরে উপস্থিত হন। রাত্রিতে লক্ষ্মণ ও ইল্লামা দুজনেই ভগবানের আদেশ পান, বল্লভ মৃত নন, স্বয়ং ভগবান বল্লভের মূর্তিতে জন্ম নিয়েছেন তাকে নিয়ে আসতে হবে। ভগবানের আদেশ পেয়ে লক্ষ্মণ ভট্ট ও তাঁর স্ত্রী ফিরে গিয়ে দেখেন শিশুর চারিদিকে আগুন জলছে এবং শিশু অগ্নি পরিবেষ্টিত নিরাপত্তার মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। সেই অগ্নি বেষ্টনীর মধ্যে হাত বাড়িয়ে বল্লভের জননী তাকে কোলে নেন।

বল্লভাচার্যের জন্ম মুহূর্ত সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে। গভীর চম্পা অরণ্যের মধ্যে যে মুহূর্তে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে চম্পারণ্য থেকে বহু দূরে মথুরার চোদ্দ মাইল পশ্চিমে ব্রজে গোবর্ধন পর্বতের উপরে কালো-পাথরের একখানি উঁচু হাতের সঙ্গে একখানি মুখ ভেসে ওঠে। এই মূর্তি দর্শন করবার জন্য বহুলোক জড় হয় এবং এই মূর্তির নামকরণ হয় দেবদমন। এই মূর্তিই পরে শ্রীগোবর্ধননাথজী বা সংক্ষেপে শ্রীনাথজী বলে খ্যাত হয়।

এই জনশ্রুতির সঙ্গে আরো একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই—বল্লভাচার্যের জন্মের কিছু কম একশ বছর আগে ১৪১০ খৃষ্টাব্দে, ১১ই বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে কালোপাথরের একটি উঁচু হাত মাটির ওপর ভেসে ওঠে। একজন রাখাল এটি দেখতে পেয়ে তার বন্ধুদের খবর দেয় এবং যেহেতু এই দিনটি ছিল নাগপঞ্চমীর দিন,—যে দিনে সারা ভারতবর্ষে সর্পদেবতার পূজা হয়। স্থানীয় লোকেরা মূর্তিটিকে সর্পদেবতার মূর্তি মনে করে দুধ দিয়ে এর ভোগের আয়োজন করে এবং সকলে মিলে ঠিক করে যে প্রতি বৎসর এই মূর্তির সম্মানার্থে এখানে একটি ধর্ম মেলা বসবে।

শ্রীভগবানের মুখ থেকেই জাগতিক সকল প্রকার শব্দের উৎপত্তি, আবার শ্রীভগবানের মুখ বিবরেই লেলিহান প্রলয়াগ্নি প্রজ্জ্বলিত, গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন এই অগ্নি প্রত্যক্ষ করে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। বল্লভাচার্য ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্র লাভ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত অলৌকিক মন্ত্রের শক্তিতে বল্লভাচার্য তাঁর শিষ্যদের সকল পাপ ও কলুষতা দগ্ধ করে তাদের অগ্নিশুদ্ধ করে নিতেন, এই জন্য বল্লভাচার্যকে তাঁর সম্প্রদায় কেবলমাত্র শ্রীভগবানের মুখাবতারই নয় বৈশ্বানরের অবতার বলেও পূজা করেন। বল্লভাচার্যের অবতারত্ব ব্যাখ্যার সঙ্গে তার জন্ম সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীগুলিরও মিল লক্ষ্য করা যায়।

চম্পারণ্য রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সেই নগরে লক্ষ্মণ ভট্টের বসবাসের সুব্যবস্থা করে দেন এবং এইখানেই লক্ষ্মণ ভট্ট খবর পান যে, মুসলমানেরা বারাণসী আক্রমণ করে নি, বল্লভাচার্যের জন্মের এক মাস আগেই হুসেন শাহ শর্কী বহলুল লোদীর কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিলেন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসছিল। এই খবর পাবার পর লক্ষ্মণ ভট্ট বারাণসীতে ফিরে যান এবং আবার সেখানে আগের মতই বাস করতে থাকেন।

আট বৎসর বয়সে বল্লভাচার্যের উপনয়ন হয় এবং তার পরেই বিষ্ণুচিত্ত নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে বল্লভাচার্যের শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় শুরু হয়। বল্লভাচার্য জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং পৌরহিত্য তাঁর বংশগত পেশা, এই দুই কারণে বেদ, বেদান্ত ও সকল হিন্দু শাস্ত্র তাঁর শিক্ষার বিষয় হয়। অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ ভট্ট পরিবার সহ উড়িষ্যায় পুরীতে তীর্থযাত্রায় যান। এই সময়ে পুরীর রাজা একটি বিরাট ধর্মীয় তর্কসভার আয়োজন করেন। জগন্নাথের মন্দিরে এই তর্ক সভা বসে, বেদান্ত দর্শনের নানা সূত্র সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনাই ছিল এই তর্ক সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুসারে বল্লভাচার্য এই তর্ক সভায় যোগদিয়ে অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীদের পরাস্ত করে বিজেতার সম্মান লাভ করেছিলেন। বল্লভাচার্যের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর।

পুরীর রাজার প্রশ্ন ছিল চারটি :—

১। সব চাইতে বড় ধর্ম শাস্ত্র কি ?

২। সব চাইতে বড় কোন দেবতা ?

৩। সব চাইতে ফলপ্রসূ কোন্ মন্ত্র ?

৪। সব চাইতে সহজ ও উৎকৃষ্ট ধর্মপন্থা কি ?

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বৈষ্ণবরা ও মায়াবাদীর তর্ক বিতর্কে বহু সময় অতিবাহিত করেন। বল্লভাচার্য ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে প্রশ্নের উত্তর দেন কিন্তু মায়াবাদীরা বল্লভাচার্যের মত গ্রহণ করতে অসম্মত হন, তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে স্বয়ং জগন্নাথদেবের অনুমোদন লাভ না করলে তাঁরা বল্লভাচার্যের মত গ্রহণ করবেন না। তখন পুরীর রাজার আদেশ অনুসারে একটি সাদা কাগজ, কালি ও কলম জগন্নাথের মূর্তির সামনে রেখে দেওয়া হল এবং মন্দিরের সব কয়টি দরজা বন্ধ করে প্রত্যেক দরজার সামনে পাহারা বসানো হল। মন্দিরের দরজা যখন খোলা হল, তখন দেখা গেল জগন্নাথদেবের মূর্তির সামনে সাদা কাগজে সংস্কৃতে একটি শ্লোক লেখা। শ্লোকের অর্থ এই :—

১। সব চাইতে বড় ধর্ম শাস্ত্র—গীতা

২। সব চাইতে বড় দেবতা—দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

৩। সব চাইতে ফলপ্রসূ মন্ত্র—শ্রীকৃষ্ণের যে কোন নাম।

৪। সব চাইতে উৎকৃষ্ট সহজ ধর্ম পন্থা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

মায়াবাদী পণ্ডিতেরা জগন্নাথদেবের লিখিত উত্তর আশা করেন নাই, তাঁরা এই উত্তর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন কেননা জগন্নাথের হাত নাই, উত্তর লিখে দেওয়া তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব। কিন্তু যখন দেব জগন্নাথ মায়াবাদীদের তীব্র নিন্দা করে আর একটি শ্লোক লিখে দিলেন তখন পুরীর রাজা বিশেষ রাগান্বিত হয়ে মায়াবাদীদের মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বল্লভাচার্যকে বহু পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করলেন।

এই ঘটনার পর বৎসর ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণ ভট্টের দেহান্ত হয়। কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে একা বারাণসীতে বাস করার চেয়ে স্বদেশে নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে যাওয়াই ইল্লামা ভালো মনে করেন এবং বল্লভাচার্যের পরিবারের বারাণসী বাস সমাপ্ত হয়।

বিজয় নগরে মামাবাড়ীতে মা ও ভাইবোনদের রেখে বল্লভাচার্য দেশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। তিনবার দেশভ্রমণে বেরিয়ে বল্লভাচার্য নানা তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি তাঁর ধর্মমত প্রচার এবং সম্প্রদায় গঠনের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে যাতে বল্লভাচার্যের ধর্মের তাৎপর্য ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ঠিক মত বোঝা সম্ভব হয়।

বল্লভাচার্য ১৪৯৩ থেকে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উনিশ বৎসর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন। এবং এই দেশভ্রমণ কালে চারটি ঘটনা বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাগুলির প্রথম ব্রহ্মসম্বন্ধ মন্ত্র লাভ। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভাচার্য যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণরত, তখন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পান, যে গোবর্ধন পর্বতে তাঁর যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই আদেশ অনুসারে বল্লভাচার্য ব্রজে চলে যান। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজে নানাতীর্থ পর্যটনের কালে বল্লভাচার্য কিছুদিন মথুরার সাত মাইল দক্ষিণপূর্বে যমুনাতীরে গোকুলে অবস্থান করেন। এই গোকুলে ১১ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের মধ্যরাত্রিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বল্লভাচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম এই দান করেন। ঘটনার কালে বল্লভাচার্যের ঘনিষ্ঠ সহচর দামোদর হরসানী উপস্থিত ছিলেন। দামোদর দৈবকণ্ঠের বাণী শুনেছিলেন কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন নি। পরদিন সকালবেলা

বল্লভাচার্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাওয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্রে দামোদর হরাসানীকে দীক্ষা দেন এবং দামোদরই প্রথম সেবক হিসাবে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লভাচার্যের নির্দেশে গিরিগোবর্ধনের উপরে আবির্ভূত দেবদমন মূর্তি গোবর্দ্ধননাথজী বা সংক্ষেপে শ্রীনাথজীর মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কুটির এই দেবমূর্তির আশ্রয়গৃহরূপে নির্মিত হয় এবং কিংবদন্তী অনুসারে রামদাস চৌহান নামে এক ব্যক্তি শ্রীনাথজীর বিগ্রহের আদেশে বল্লভাচার্যের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা জানান এবং তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করেন শ্রীনাথজীর সেবা করবার জন্য। বল্লভাচার্য রামদাস চৌহানকে দীক্ষা দান করেন এবং তাঁকে শ্রীনাথজীর সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীনাথজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ছয় বৎসর পর বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের অম্বালা প্রদেশের এক ধনী ব্যবসায়ী পূর্ণমল্ল ক্ষত্রী স্বপ্নে আদেশ পান শ্রীনাথজীর মন্দির নির্মাণ করবার জন্য। পূর্ণমল্ল বল্লভাচার্যের অনুমতি নিয়ে কারিগর নিযুক্ত করে মন্দির তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। মন্দির অর্দ্ধেক শেষ না হতেই পূর্ণমল্লের সব অর্থ শেষ হয়ে যায়। এরপরে পূর্ণমল্ল কিছুদিন মন্দির তৈরী করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ আরম্ভের কুড়ি বৎসর পরে শ্রীনাথজীর মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। এই সুনির্মিত সুদৃঢ় অট্টালিকা সদৃশ বিরাট মন্দিরে গোবর্ধননাথের পূজা সমারোহের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হত। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই মন্দিরের বিগ্রহটিকে ব্রজ থেকে বর্তমান রাজস্থানের নাথদ্বারে স্থানান্তরিত করা হয়। এর পরেই গোবর্দ্ধননাথের পরিত্যক্ত এই মন্দির ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

বল্লভাচার্যের দেশভ্রমণকালীন ঘটনাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বল্লভাচার্যের পরিণয়ের জন্য শ্রীভগবানের আদেশ। ১৫০১ থেকে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বল্লভাচার্য দ্বিতীয়বার দেশভ্রমণে বেরিয়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধর-পুরের বৈষ্ণব বিগ্রহ বিঠলনাথের মূর্তি দর্শন করতে যান। কিংবদন্তী অনুসারে এই মূর্তি দর্শনের সময় বল্লভাচার্য স্বয়ং ভগবানের আদেশ পান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য। বিজ্ঞজনেরা এই দৈবাদেশের দুইরকম সমালোচনা করেন— একদলের মতে এই দৈবাদেশের উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বল্লভাচার্যের বংশধর রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন, অপর দলের মতে বল্লভাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান, সন্ততি, বংশধরেরা তাঁর প্রচারিত ভক্তিমার্গ সাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন।

গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, সব ধর্মগুরুই ধর্ম প্রচারের জন্য সন্ন্যাসের পথকে বেছে নিয়েছিলেন। দৈবাদেশ না পেলে বল্লভাচার্যও চির-কুমারই থাকতেন। মৃত্যুর একমাস আগে তিনি বারাণসীতে গঙ্গার তীরে হনুমান ঘাটে বাস করেন এবং যোগ তপস্যায় রত থাকেন। তবে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন বল্লভাচার্য ধর্মাচরণের জন্য সন্ন্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর প্রচারিত ভক্তিমার্গ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ। বল্লভাচার্যের দৃঢ় ধারণা ছিল সন্ন্যাস মানুষকে স্বার্থপর ও অহঙ্কারী করে কেননা সন্ন্যাসী কেবলমাত্র নিজেরই আত্মিক উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে এবং নিজেকে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর জীব বলে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গের সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কোনো বিরোধ নেই। গৃহীর জীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গে বাধা সৃষ্টি করে না বা অন্তরায় হয় না। এই জন্যই বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এই সম্প্রদায়ের গুরু এবং শিষ্য উভয়েই বিবাহিত ও গৃহী হতে পারেন।

বল্লভাচার্যের পরিণয়ের জন্য দৈবাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছিল এই সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান নির্দেশে।

বল্লভাচার্য স্বয়ং ভগবানের দেওয়া মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন বলে তাঁর জীবৎকালে তিনি ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের আর কারুর দীক্ষা দেবার অধিকার ছিল না। বল্লভাচার্যের শিষ্য সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর ধর্মমত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং অনেকেই জীবন দিয়ে বল্লভাচার্যের বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কারুর দীক্ষা দেবার অধিকার ছিল না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করতে পারতেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন কিন্তু সম্প্রদায়ের গুরুর অধিকার একমাত্র বল্লভাচার্যেরই ছিল। বল্লভাচার্যের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য, দামোদর হরসানী—বল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিঠলনাথকে সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও সম্প্রদায়ের কোনো নূতন শিষ্যকে দীক্ষা দানের অধিকার লাভ করতে পারেননি।

বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের গুরুর অধিকার এইভাবে সীমাবদ্ধ হওয়াতে বল্লভাচার্যের মৃত্যুরপর তাঁর সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। পন্ধরপুরের বিঠলনাথের বিগ্রহের আদেশে বল্লভাচার্যের পরিণয়ের ফলে বল্লভাচার্যের বংশধরের সম্প্রদায়ে গুরুর স্থান লাভ করবার সুযোগ পায়।

বল্লভাচার্যের দুই পুত্র, গোপীনাথ বলরামের এবং বিঠ্‌ঠলনাথের মধ্যে কিংবদন্তী অনুসারে গোপীনাথ এবং বিঠ্‌ঠলনাথ বিঠ্‌ঠলনাথের অবতার ছিলেন। পিতার নিকটে ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্রলাভ করবার পর গোপীনাথ ও বিঠ্‌ঠলনাথ সম্প্রদায়ের নূতন শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন, এবং তাঁদের স্থান বল্লভাচার্যের সমানই প্রভাবশালী ছিল। বল্লভাচার্যের বংশধরদের কাছে দীক্ষা না নিলে এই সম্প্রদায়ের সেবকেরা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন না, এই কারণে বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় একান্তভাবেই গুরু সর্বস্ব হয়ে ওঠে। গুরু সর্বস্বতার জন্য বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল তাঁদের নিজেদের গুরুদের ভগবানের অবতার জ্ঞানে পূজা করতেন এবং একমাত্র তাঁদের বাণীই ধর্ম সাধনার একমাত্র পথ নির্দেশ মনে করতেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিগ্রহ, পূজা পদ্ধতি, আচার বিচারে বিরোধী ছিলেন।

গল্প আছে, বল্লভাচার্যের আটজন প্রধান শিষ্য যাদের অষ্ট সখা বলা হত, তাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস মীরাবাঈ-এর বাড়ীতে বাস করতে আপত্তি করেন, কেননা তাঁর বাড়ীতে ভক্তি মার্গী অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরাও থাকতেন।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিঠ্‌ঠলনাথের সাতটি পুত্রকে বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের গুরুর পদ দেওয়া হয়। তাঁরা সাতটি স্বরূপ অথবা বিগ্রহ লাভ করেন। এই সাতটি বিগ্রহই বল্লভাচার্যের নিজস্ব ছিল।

যতদিন বল্লভাচার্যের দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিঠ্‌ঠলনাথ সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন, ততদিন এদের একমাত্র মন্দির ছিল গোবর্ধনের মন্দির এবং একমাত্র বিগ্রহ ছিল শ্রীনাথজী।

বিঠ্‌ঠলনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সাতটি ছেলের সাতটি শিষ্যদলের সৃষ্টি হয় এবং সাতটি বিভিন্ন জায়গায় সাতটি বিগ্রহ স্থাপিত হয়। বিঠ্‌ঠলনাথের সাতটি পুত্রের সাতটি শিষ্যদলের বিগ্রহ আলাদা হলেও এঁদের ধর্মসাধন পদ্ধতি একই ছিল। বল্লভাচার্য পুষ্টিমার্গ বলে যে ভক্তিমার্গের সাধনা প্রচার করেছিলেন, তাই ছিল এই সাতটি শাখার ধর্মমত। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও ধর্ম সাধনার দিক দিয়ে এই সাতটি শাখা সম্প্রদায় হিসাবে একই ছিল।

বিঠ্‌ঠলনাথের প্রথম পুত্র গিরিধরের স্থান আধ্যাত্মিক জগতে খুব উঁচুতে ছিল। একই বিগ্রহ ছিল গিরিগোবর্ধনের বিগ্রহ গোবর্ধননাথজী বা শ্রীনাথজী। রাজস্থানের উদয়পুর রাজ্যে নাথদ্বারে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং

বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের সমস্ত কেন্দ্র থেকে এইখানেই সবচেয়ে বেশী তীর্থযাত্রী সমাগত হত। বিঠ্‌ঠলনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে ছিলেন বিঠ্‌ঠলনাথের চতুর্থ পুত্র গোকুলনাথ (১৫৫২-১৬৪১) এবং প্রপৌত্র হরিরায় (১৫৯১-১৭৭১)। হরিরায় চৌরাশী বৈষ্ণব কি বার্তার বর্তমান সংস্করণ রচনা করেন। বল্লভাচার্যের "বংশের সপ্তম" পুরুষ পুরুষোত্তম একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। এর পর থেকেই বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা হয়। এই মামলার ফলে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের খুব ক্ষতি হয়।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অভিযোগ করেন ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌মারডো (Captain Macmurdo) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি কচ্ছ দেশের বৃটিশ রাজ প্রতিনিধি (Resident) ছিলেন। তিনি মহারাজদের সম্পর্কে লিখেছিলেন—* (Ballabhacaryya—Manilal Parekh)

"The Bhatias are of Sindh Origin. They are the most numerous and wealthy merchants in the country, and worship the Gosainjee Maharajas of whom there are many. The Maharaja is the master of their property and disposes of it as he pleases ; and such is the veneration in which he is held, that the most respectable families consider themselves honoured by his cohabiting with their wives and daughters".

এর কিছুদিন পর ফার্সী ভাষায় লেখা কাশীর বৃত্তান্ত বলে একখানি বই বেরোয়। বইখানির রচয়িতা ছিলেন মুন্সী সিলাল সেখ। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর সরকারী কলেজের অধ্যাপক ফ্রেডেরিক হল (Frederick Hall) ইংরাজীতে এই বইটির অনুবাদ করেন। এই বইএ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

"The Gokalnath Gosainjees :

They are generally known by the name of Gokalnath.

---

* Manilal Parekh

In all their outward appearance, they are like the Vrindabana Gosains (These are the leaders of Chaitanya Sampradaya) and they apply the Kaslika (A mark made on the forehead with a particular kind of clay some kind of powder as a sign of one's belonging to a particular sampradaya) in a different way and their followers are mostly Gunjrati Grocers or "Banias" who carry on the business of the Maharaj as or Bankers. Few other people are include to become their followers. Their followers, whether men or women, at the time of becoming their followers, make an offering to the Guru, of these three things Viz, body, mind and wealth that is, for his service and gratification and they with old not from him their bodies, heart and gold. Men and women unfailingly go once everyday and some of them three times in order to behold the fact of their spiritual guide or the child (Image) and besides this, they are so firm in their good faith, that when they marry, they first send their wives to their spiritual guide, without having made use of them, and the leavings of their accomplished guides are afterwards tasted by their ignorant disciples. The good and drinks of these Gosains are delicious and luxurious and most of them are wealthy". (Ballabhacaryya—Manilal Parekh)

ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের এই দুইটি বিবরণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এইগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে সেই সময়ে মহারাজা নামধারী বৈষ্ণব গোঁসাইদের কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘৃণিত স্তরে নেমে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বোম্বাই শহর ধনসমৃদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। ফলে কচ্ছ, কাঠিওয়ার, গুজরাট প্রভৃতি স্থানের অগণিত ব্যবসায়ী বোম্বাই শহরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং বোম্বাই শহরে শহরে এরাই প্রধানত ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তোলে। এই নবাগত দলের মধ্যে ভাটিয়ারা ছিল সর্বপ্রধান এবং এরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এদের সঙ্গে

এদের জন্ত কারো গুরু আসে এবং এরাই কুখ্যাত মহারাজা নামধারী বৈষ্ণব গোঁসাইগোষ্ঠী।

মহারাজাদের কার্যকলাপ এমন আকার ধারণ করেছিল যে ভাটিয়ারা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি সভায় মিলিত হয়ে একটি প্রস্তাব আনে যে নববিবাহিতা তরুণীদের মন্দিরে যেতে দেওয়া হবে না, তারা মন্দিরে এমন সময়ে যাবে যখন মহারাজারা নির্জনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। বলা বাহুল্য এই সভার বা সভায় গৃহীত প্রস্তাবের কোনো ফল হয়নি। তবে কয়েকজন বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কারক তাদের ধর্ম সম্প্রদায়কে সমস্ত কলুষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং ধর্ম সাধনার পথে সমস্ত পাপাচার দূর করতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণ এঁদের চেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং খবরের কাগজে মহারাজাদের ঘৃণিত কার্যকলাপ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে ইংরেজ ভারতবর্ষে স্কুল, কলেজ তৈরী করতে আরম্ভ করেছে এবং পশ্চিমের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় নানা ভাবধারা ভারতবর্ষে এসে পৌছাচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে করসোনদাস মলজী, একজন বেণিয়া যুবক মহারাজাদের পাপাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হাতে তুলে নেন। করসোনদাস বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি দৃঢ় পদে এগিয়ে এসে স্পষ্টভাবে মহারাজাদের জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন। করসোনদাসের তীব্র মতামত তাঁর স্বীয় পরিচালিত একটি সংবাদপত্র "সত্য প্রকাশে" প্রকাশিত হয়। এই কাজে করসোনদাস এবং নর্মদাশঙ্করের আক্রমণ এত তীব্র হয় এবং সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের মধ্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে মহারাজারা কি করবে ভেবে না পেয়ে বোম্বাই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এই সময়ে মহারাজদেরই একজন, যদুনাথ, যদিও সে বোম্বাইএর অধিবাসী না হয়ে সুরাটবাসী ছিল করসোনদাসের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত তার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করে। মহারাজদের দুর্নীতিমূলক সমস্ত কদর্য কার্যকলাপ এই মামলায় তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করা হয়। যদুনাথের নিজের জীবনও বাদ পড়ে না। দেখা যায় যদুনাথ অন্যান্য মহারাজদেরই সমগোত্রীয় ভিন্ন কিছুই নয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর সুপ্রীম কোর্টে চব্বিশ দিন শুনানীর পর দুইজন ইংরেজ বিচারক করসোনদাসের পক্ষে রায় দেন এবং করসোনদাস মামলায় জয়লাভ করেন। করসোনদাসের জয় বল্লভাচার্য

সম্প্রদায়কে চরম অবনতি থেকে রক্ষা করেছিল সত্য, কিন্তু এইখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। করসোনদাস মহারাজাদের কদাচারের জন্য দায়ী করেছিলেন বল্লভাচার্যের ধর্মনীতিকে। সেটি বিরাট একটি ভুল। করসোনদাস প্রমাণ স্বরূপ আদালতে পেশ করেছিলেন বল্লভাচার্যের "সিদ্ধান্ত রহস্তের" একটি টীকা ব্রজভাষায় লেখা। সংস্কৃতে এর মূল রচনা করেন গোকুলনাথ, বল্লভাচার্যের পৌত্র। এই টীকাটি আসলে বল্লভাচার্যের ব্রহ্ম সম্বন্ধে মন্ত্রের আত্মনিবেদন অংশের ব্যাখ্যা; সেখানে বলা হয়েছে যা কিছু জাগতিক ভোগের বস্তু সবই ভোগ করার আগে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করতে হবে, এমন কি নববিবাহিতা বধূকেও। ব্রজভাষায় লেখা টীকায় শ্রীকৃষ্ণের জায়গায় আচার্য কথাটি যোগ করা ছিল এবং যেহেতু আচার্য শব্দটির অর্থ গুরু—মহারাজেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য টীকাটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

করসোনদাস সংস্কৃত জানতেন না। তাঁর অভিযোগের ভিত্তি ছিল কবি চরিত্র, বলে মহারাষ্ট্রীয় একটি বই "কবিচরিত্র" ব্রজভাষায় লেখা।

বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গের নবম বা শেষধাপে আত্মনিবেদন। এই আত্ম-নিবেদনের মন্ত্রের অর্থ এই:—ওম। শ্রীকৃষ্ণই আমার আশ্রয়। সহস্র বৎসর ধরে শ্রীকৃষ্ণ বিরহের অন্তহীন বেদনা ও যন্ত্রণা ক্রমাগত ভোগ করে হতবুদ্ধি হয়ে আমি সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার সর্বস্ব—আমার দৈহিক কার্যক্ষমতা, আমার জীবন, আমার আত্মা এবং আত্মা বিষয়ে যা কিছু আমার স্ত্রী, গৃহ, সন্তান-সন্ততি, আমার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি, আমার সমস্ত বস্তু সম্পদ এবং আমার নিজেকে সমর্পণ করিতেছি। হে কৃষ্ণ। আমি তোমার দাস।

ভাবার্থের দিক দিয়ে বল্লভাচার্যের এই বাণী

বিত্তাপতির। মাধবা হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ। দীন দয়াময়
অতয় তোহোরি বিশোয়াসা বা
মাধব! বহুত মিনতি করু তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।

অথবা চণ্ডীদাসের

॥ সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া।
হৈলাম চরণে দাস—এই সব পদেরই নামান্তর।

বল্লভাচার্যের এই বাণীর চেয়ে মহত্তর এবং পবিত্রতর ধর্ম—উপদেশ আর কিছু হতে পারে না এবং ভক্তের পক্ষে এর চেয়ে গভীরতর ভক্তির প্রকাশও আর কিছুতে পাওয়া যায় না। বল্লভাচার্যের ধর্মমতের মর্মার্থ সম্বন্ধে যদিও করসোনদাস ভুল করেছিলেন, তবু তাঁর এই ভুল বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গল হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং তার প্রচেষ্টা বল্লভাচার্যের তুলনাবিহীন ভক্তি-ধর্মকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিল সন্দেহ নেই।

তৃতীয়বার দেশভ্রমণের শেষভাগে যখন বল্লভাচার্য কিছুদিন তাঁর স্বদেশে কান্কর বাদ গ্রামে অবস্থান করছিলেন, তখন খবর পান যে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায় একটা শাস্ত্রার্থ বা ধর্মীয় তর্ক সভা আহ্বান করেছেন। এই সভায় নানা শাস্ত্রের অর্থ, ভাষ্য ইত্যাদি দিয়ে বিচার তর্ক হবে এবং মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী এবং রামানুজাচার্যের প্রতিনিধিবর্গ এবং আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যোগ দেবেন। এই খবর পেয়ে বল্লভাচার্য আচার্য ব্যাসতীর্থের কাছে গিয়ে সভায় যোগ দেবার অনুমতি চান, ব্যাসতীর্থ খুব আনন্দিত হয়ে বল্লভাচার্যকে অনুমতি দেন। বল্লভাচার্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির বলে মায়া-বাদীরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় বহু স্বর্ণমুদ্রা বল্লভাচার্যকে পুরস্কার দেন। শোনা যায় বল্লভাচার্য মাত্র সাতটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে বাকী সব, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করেন।

আচার্য ব্যাসতীর্থ বল্লভাচার্যকে মধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য পদ গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন না, তখন বিল্বমঙ্গল তাঁকে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য পদ নিতে বলেন এবং বল্লভাচার্য সম্মত হন।

বল্লভাচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত অলৌকিক মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিলেন বলে তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কোনো মানব গুরুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না কিন্তু বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট মিল আছে। জনশ্রুতি অনুসারে বল্লভাচার্যের পরিবারের সঙ্গে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

নাভাজীর—ভক্তমাল গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে বিষ্ণুস্বামী একজন দ্রাবিড় প্রধানের মন্ত্রণা সভার এক সভ্যের পুত্র ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর উত্তরাধিকারী হিসাবে জ্ঞানদেব, নামদেব, ত্রিলোচন এবং সর্বশেষ বল্লভাচার্যের নাম করা হয়েছে।

জ্ঞানদেব ছিলেন এক ব্যক্তির তিনপুত্রের একজন। জ্ঞানদেবের পিতা

সন্ন্যাস গ্রহণ করে আবার গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসেন বলে জ্ঞানদেবকে সমস্ত ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং বেদপাঠের অধিকারচ্যুত করা হয়েছিল।

জনশ্রুতি অনুসারে জ্ঞানদেব অলৌকিক শক্তির বলে একটা মহিষকে দিয়ে বেদপাঠ করিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মাতৃভাষায় লিখিত গীতার একটি ভাষ্যে জ্ঞানদেব সম্বন্ধে এই একই গল্প পাওয়া যায়। বিষ্ণুস্বামী জ্ঞানদেবের গুরু ছিলেন কিনা বা জ্ঞানদেব বিষ্ণুস্বামীর ধর্মমতের অনুসরণকারী ছিলেন কিনা সে সব বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা অবগত ছিলেন না। যদি ভক্তমালের বিবরণ ঠিক হয়, তা হলে বিষ্ণুস্বামী ১২১২ শক বা ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জীবিত ছিলেন। বিষ্ণুস্বামীর ধর্মমত গিরিধর রচিত শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড এবং বালকৃষ্ণ ভট্টের প্রমেয়রত্নার্ণবে পাওয়া যায়।

বল্লভাচার্যের দেশভ্রমণকালীন ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেবা ধর্মানুষ্ঠান প্রচার। বল্লভাচার্য যেদিন থেকে ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্র লাভ করেন, সেইদিন থেকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাধর্ম প্রচার করেন। আজ পর্যন্ত বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মন্দির বা হাভেলী গুলিতে পুরোহিতেরা এই সেবা ধর্মানুষ্ঠানই পালন করেন।

বল্লভাচার্যের ধর্মমত

বল্লভাচার্যের ধর্মমত—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভারতীয় ষড়দর্শনের—একটি শাখা। দার্শনিক হিসাবে বল্লভাচার্যের নাম মধ্ব, নিম্বার্ক ও রামানুজের সঙ্গে একই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুদ্ধাদ্বৈতাবাদের মূল বেদান্তের মধ্যে নিহিত। বেদান্তের দুইটি ভাগ—মায়াবাদ ও ভক্তিবাদ। মায়াবাদী ও ভক্তিবাদীদের মত পার্থক্য সংক্ষেপে বলা যায় যে মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, এবং তাঁদের মতে মায়া একটি পৃথক শক্তি রূপে ব্রহ্মের বাইরে জীব জগতের মধ্যে কাজ করছে। একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান অর্জনই জীবকে মায়ার কবল থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই বিষয়ে মায়াবাদীদের জ্ঞানমার্গী বলা চলে। অন্যপক্ষে ভক্তিবাদীরা জগৎসৃষ্টির কারণ স্বরূপ পরম ব্রহ্মের অদ্বৈত সত্তাকে স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মের বাইরে অন্য কোনো শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ভক্তিবাদীদের মতে ব্রহ্ম সগুণ এবং ব্রহ্মের মধ্যেই জাগতিক সব শক্তি বর্তমান। ব্রহ্ম নিজে শক্তি বলে জীব জগৎকে সৃষ্টি করেছেন নিজের সৃষ্টি মাধুর্য উপভোগ করবা

জন্য। পরমব্রহ্মের এই ইচ্ছার জন্যই তাঁর সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ বিচিত্র লীলার। আপাতঃদৃষ্টিতে জাগতিক জীবসত্তা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন হলেও মূলে ভিন্ন হয় এবং সেই জন্যই জীব পরব্রহ্মের অনুগ্রহে পৃথক অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পায় তাঁর শরণাগতিতে।

ভক্তিবাদীরা জীবজগৎকে সর্বশক্তিমান অদ্বৈত পরমব্রহ্মের দ্বৈত সত্তার প্রকাশ বলে স্বীকার করেন এবং পরম ব্রহ্ম ও জীবের লীলায় বিশ্বাস করেন। এ ক্ষেত্রে ভক্তিবাদীরা অদ্বৈতবাদী হয়েও দ্বৈতবাদী।

তত্বার্থ দীপ নিবন্ধে বল্লভাচার্যের যে দার্শনিক মত প্রচারিত হয়েছে সে অনুসারে জগৎ ও জীবন স্বয়ং ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন অগ্নি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। এই কারণে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দরূপ তিরোভূত বা গুপ্ত। কেবলমাত্র ব্রহ্মের নিজ ইচ্ছায় জীব এই আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ হন। ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত—এইভাবে মুণ্ডক উপনিষতে পাওয়া যায়।

তদেতৎ সত্যম যথা সুদীপ্তাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ।
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চ এব অপি যন্তি॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড, শ্লোক ১।

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে বল্লভাচার্যের ধর্মমতের সাদৃশ্যের উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে বল্লভাচার্যের তত্বার্থ দীপ নিবন্ধে প্রচারিত জগৎ ও জীবের সম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষৎ অনুসারী। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদের ভিত্তি মুণ্ডক উপনিষতের একটি শ্লোক—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটা স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।

ভক্তিবাদীদের কাছে জগৎসৃষ্টির কারণ স্বরূপ অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম নিজের

ইচ্ছায় নানারূপে নানা নামে ব্যক্তিগত ভগবান রূপে আবির্ভূত হন এবং ভক্তের সঙ্গে নানা বিচিত্র লীলায় রত হন। ভক্তের পক্ষে ভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও তাঁর শরণাগতিই ভক্তিবাদীদের একমাত্র সাধন পন্থা। তবে এই সাধন পথের খুঁটিনাটি ভক্তিমার্গীদের নানা মত পার্থক্য ও নানা জটিল তর্ক বিচারের বিষয়।

বল্লভাচার্যের জীবন দর্শন আলোচনা করলে সুরু করতে হবে তাঁর ব্রহ্মসম্বন্ধ মন্ত্র লাভের দিন থেকে। ব্রহ্মসম্বন্ধ কথাটির অর্থ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বা যোগাযোগ। বল্লভাচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই মন্ত্রটী লাভ করেছিলেন এবং মন্ত্রটী ছিল শ্রীকৃষ্ণশরণং মম।

স্পষ্টই বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণশরণং মম মন্ত্রে বল্লভাচার্য তাঁর সম্প্রদায়ের সেবকদের দীক্ষা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরম ব্রহ্ম ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। এই জন্যই বলভাচার্য ভক্তিবাদীদের জন্য যে পুষ্টিমার্গ প্রচার করেছিলেন তার সাধন পথ ছিল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতির সাধনা। সন্ন্যাস নয়, ধূপ দীপ নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা অর্চনা নয়, একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং তাঁর চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

বল্লভাচার্য সন্ন্যাসে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর একমাত্র বিশ্বাস ছিল ভক্তের প্রাণঢালা শ্রীকৃষ্ণসেবায়। এই সেবার দুটো দিক আছে। একটা বাহ্য অনুষ্ঠান, অন্যটা মানবমনের অলৌকিক রূপান্তর। এই রূপান্তরের মধ্যে নানা ভাব নানা পর্যায় আছে ; শেষ পর্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বস্ব নিবেদন এবং ভাবের অনুভূতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্বিরহ। বল্লভাচার্যের জন্ম হয়েছিল ঘোর কলিযুগে এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যুগের সকল মানুষই কদাচার ও নানা পাপ কাজে মগ্ন, সেই জন্যই তিনি তাঁর অলৌকিক মন্ত্র বলে তার সম্প্রদায়ের লোকদের সমস্ত দোষ বা পাপ পুড়িয়ে দিয়ে তাদের শুদ্ধ করে নিতেন।

বল্লভাচার্যের ভক্তি মার্গ পুষ্টিমার্গ বলে পরিচিত। ভক্তিমার্গের এই নূতন নামকরণের একটি হেতু আছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের প্রথম পংক্তি পোষণম তদনুগ্রহং। এই পংক্তির মধ্যে পোষণ কথাটার অর্থ শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। যারা শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত হবে, ভগবান তাদেরই পোষণ করবেন অর্থাৎ তারাই শ্রীভবানের অনুগ্রহ লাভ করবে। এই অর্থ ধরে বল্লভাচার্য ভক্তিমার্গের নূতন নামকরণ করেছিলেন পুষ্টিমার্গ। ভক্তিমার্গে সাধনার চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বস্ব

নিবেদনের যে মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম বল্লভাচার্য পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্র কিংবদন্তী মাত্র নয় সত্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভগবানের শ্রীমুখের বাণী।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। মোক্ষ। ৫৭।৫৮ শ্লোকে সাংসারিক মোহ বা অবিদ্যা থেকে মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ
বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব দুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

অর্থাৎ তুমি মনের দ্বারা সর্বকর্ম আমাকে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ। আমাতে চিত্ত রাখিলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিবে। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ না শোন, বিনষ্ট হইবে।

গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়। মোক্ষ। ৬৫।৬৬ শ্লোকে শ্রীভগবান আরো স্পষ্ট বলেছেন—

মন্মনা ভব মদভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি তে সত্যং প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ

অর্থাৎ আমাগত চিত্ত আমার ভক্ত ও আমার পূজক হও। এবং আমাকেই নমস্কার কর এইরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করিব, দুঃখ করিও না।

বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গের আটটি ধাপ।

শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলা ইত্যাদি শ্রবণ।

কীর্তণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলা বাদ্য যন্ত্র সহকারে উচ্চস্বরে গান।

স্মরণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ।

পদসেবন। বিগ্রহের পাদ পূজা।

অর্চন। সেবা।

বন্দন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা।

দাস্য। শ্রীকৃষ্ণের দাস ভাবে মানসিক আরাধনা।

সখ্য। শ্রীকৃষ্ণের সখা ভাবে মানসিক আরাধনা।

পুষ্টিমার্গের নবম বা শেষধাপ—

আত্ম নিবেদন। সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণা।

পুষ্টিমার্গের এই নয়টি স্তর বেশীর ভাগ ভক্তি সম্প্রদায়েই গৃহীত হয়েছে এবং এই গুলির বিস্তৃত বিশদ ব্যাখ্যা রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে পাওয়া যায়।

পুষ্টিমার্গের পঞ্চম স্তর অর্চন বা অর্চনা কিন্তু সাধারণ হিন্দু মন্দিরের পূজা অনুষ্ঠান নয়। এই অর্চনা হচ্ছে সেবা। এবং এই সেবাধর্ম প্রচারেই বল্লভাচার্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

সেবার দুটো দিকের মধ্যে বাহ্য অনুষ্ঠান বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মন্দির বা হভেলী গুলিতে অনুষ্ঠিত হয়।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলির নাম হভেলী। এই শব্দটার অর্থ নিজস্ব ও নির্জন গৃহ। সেই জন্যই যে কোনো লোকের সময়ে হভেলী গুলিতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের জন্য দিনটাকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ভাগ গুলিই দর্শনের সময়। একমাত্র এই দর্শনের সময়ই অনেক লোক হভেলী গুলিতে সমবেত হয়। সেবার সময় যে আটভাগে ভাগ করা হয়, সেগুলি এই :—

মঙ্গল—ভোরবেলা বিগ্রহকে জাগিয়ে ফল ভোগ দেওয়া।

শৃঙ্গার—সকাল বেলা দৈনিক সজ্জা ঋতু অনুযায়ী।

গোয়াল—গোচারণ—সকালবেলা।

রাজভোগ—মধ্যাহ্ন ভোজন নানারকম দুধের তৈরী খাবার নানাবিধ তরকারী ইত্যাদি।

উৎথাপন—দুপুরের ঘুম থেকে জাগানো।

ভোগ—বৈকালী জল খাবার।

সন্ধ্যারত্তি—সান্ধ্যকালীন ভোগ, ধূপ দীপের আরতি।

শয়ন—বিগ্রহকে শয্যায় শোয়ানো।

হভেলীর দরজা বন্ধ।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের হভেলী গুলিতে বিগ্রহের সেবার সময় ভোগ বা সাজ সজ্জার জন্য বিগ্রহকে স্পর্শ করবার অধিকার যে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর ছিল, তাদেরকে

বলা হত ভীতরিয়া। এরা মন্দিরের মধ্যে থাকতেন এবং এঁদের সব সময় পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধাচারে থাকতে হত। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে যখন শ্রীগোবর্ধননাথের মন্দির তৈরী সমাপ্ত হয়, তখন প্রথম ভীতরিয়া যাঁরা নিযুক্ত হন, তাঁরা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের শিষ্য বৃন্দাবনের কয়েকজন বাঙালী ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য কৃষ্ণদাসকে (অষ্টসখার একজন) মন্দিরের কার্যভার পরিচালনার জন্য এবং মন্দিরের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

বল্লভাচার্য সন্ন্যাসের জন্য গৃহত্যাগ করবার আগে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথের উপর সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করে যান। গোপীনাথের কর্তৃত্বের কালেই অভিযোগ শোনা যায় যে তারা ঐ মন্দিরের বিগ্রহের সেবার অর্থ বৃন্দাবনে তাঁদের নিজেদের গুরুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং বিগ্রহের সেবাও বল্লভাচার্যের সেবকদের মত না করে গোবর্ধননাথের সঙ্গে একটি দেবী মূর্তিও পূজা করছেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ কৃষ্ণদাস বাঙালীদের বিতাড়িত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু বল্লভাচার্য স্বয়ং বাঙালীদের নিযুক্ত করেছিলেন বা গোপীনাথ তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু করতে অস্বীকার করেন।

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীরা গোবর্ধনের মন্দির থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালীরা চেষ্টা করতে থাকেন আবার ঐ মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্য এবং ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা সম্রাট আকবরের সহায়তার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু সম্রাট আকবর স্বীকৃত না হওয়ায় গোবর্ধনের মন্দিরে পুনঃ প্রবেশের আশা বাঙালীরা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেন।

প্রতিদিনের সেবা অনুষ্ঠান ছাড়াও বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মন্দির গুলিতে হোলি, জন্মাষ্টমী অন্নকূট উৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। এবং ঐ গুলি ছাড়াও নাগপঞ্চমীর দিনে শ্রীগোবর্ধননাথের আবির্ভাবের দিন হিসাবে মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন করা হত। বল্লভাচার্য প্রত্যেকবার বিগ্রহদর্শনের সময় লীলা কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। বল্লভাচার্যের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা বিষয়ক কীর্তন রচিত হত এবং নানা চিত্র অঙ্কিত হত। বল্লভাচার্যের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্তন শুনে শুনে এবং এই বিষয়ে নানা চিত্র দেখে যাতে সেবকদের মনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়।

বর্তমানে বল্লভাচার্যের নব নির্মিত মন্দির গুলিতেও অষ্টছাপ কীর্তন গান করা হয়। এইগুলি কুম্ভনদাস, পরমানন্দদাস, কৃষ্ণদাস, সুরদাস প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখার অবতারদের রচনা।

এঁদের মধ্যে কুম্ভনদাসকে বল্লভাচার্য সমস্ত দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের জন্ম নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কুম্ভনদাস গৃহী ছিলেন। সময়াভাবে সমস্ত দিন কীর্তন করতে পারতেন না। সুরদাসই প্রথম সমস্তদিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন রচনা ও গানে নিযুক্ত থাকতেন। সুরদাসের পর পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন রচনা ও গান সারাদিনের কাজ হিসাবে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখার অবতারের মধ্যে কুম্ভনদাস, সুরদাস, পরমানন্দ দাস ও কৃষ্ণদাস বল্লভাচার্যের কাছে দীক্ষা লাভ করেন, বাকী আরো চারজনকে দীক্ষা দেন বিঠ্‌ঠলনাথ।

বল্লভাচার্য প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণের সেবাধর্মের দুটি দিকের মধ্যে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দিক ছাড়া অন্য দিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটি লৌকিকের অলৌকিক রূপান্তর। এই রূপান্তর মানসিক ভাব সাধনার মাধ্যমে। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের ভক্তি ভাব চারভাগে ভাগ করা হয়েছে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই চারটি ভাব সাধনার সঙ্গে সংস্কৃত রস শাস্ত্রের শান্ত ভাবও যোগ করা হয়েছিল। কিন্তু এই ভাব সম্বন্ধে বল্লভাচার্যের বিশেষ আগ্রহ ছিলনা। পঞ্চভাবের সাধনার মধ্যে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনাকে মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন বাৎসল্য ভাবকে। বল্লভাচার্য নিজে বাৎসল্য ভাবের সাধক ছিলেন এবং তাঁর সর্বপ্রধান শিষ্য সুরদসের পদাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি বাৎসল্য রসের পদ পাওয়া যায়।

বল্লভাচার্যের লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে শ্রীস্বামিনীজী বলে যার উল্লেখ আছে তিনিই শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের শ্রীরাধা। এবং ইনি জীবাত্মার প্রতীক নন ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর প্রতীক। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের মধুরভাবের সাধনা যে উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল, তার প্রভাব পড়েছিল বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথের উপর এবং তিনি পঞ্চভাবের সাধনার মধ্যে মধুর ভাবের সাধনার উৎকর্ষের উপরেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মধুরভাবের সাধনার মধ্যে সম্ভোগ ও বিরহের মধ্যে বিরহের স্থান খুব উচ্চে, কেননা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের যে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ, তার মধ্যে দিয়েই তাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে।

সুরদাস রচিত পদাবলীতে কতকগুলি অপূর্ব বিরহের পদ পাওয়া যায় :—

আজু বরখত নয়না হামারি।
হামারি রে
সদা রহত বরখা ঋত হাম পর
যব সে কৃষ্ণ সিধারে
নিশদিন বরখত নয়না হামারি।
অঞ্জন দে র্তৃ রহত নাহি কবহুঁ
কারে কপোলা ভয়ি কারে
সুরদাস প্রভু সো যা কহিও—
গোকুল ক্যায়সে বিসারে ॥

আজি নেমেছে বাদল আঁখিতে আমার
ঝরিছে কেবল নয়ন রে।
বিরাজে বরষা ঋতু সদা আমা পরে
গেছে চলি যবে হতে কৃষ্ণরে ॥
সেই হতে নিশিদিন অবিরত ধারে
বরষিছে মোর দুই নয়ন রে ॥
অঞ্জন দিই যদি রহে নাতো কভু
শুধুই কালিমা ভরে কপোলে কালো
সুরদাস প্রভু যাও নাগো বল
কেমনে রয়েছে সে ভুলে গোকুলেরে।

অনুবাদ—লেখিকা

বল্লভাচার্যের জীবন দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায়, যে তত্ত্বের দিক থেকে তাঁর ধর্মমত যার অনুসারীই হোক, সাধনার দিকে তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছিল শ্রীমদ্ভাগবত গীতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে পাওয়া যে অলৌকিক ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্র দিয়ে বল্লভাচার্যের ধর্মজীবনের সুরু—সে মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণশরণং মম। এই মন্ত্রের ভিত্তি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ।। মোক্ষ ।। শ্লোক ৬৬, অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

সর্ব্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ।

অর্থাৎ সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।

বল্লভাচার্য প্রচারিত পুষ্টিমার্গের নবম বা শেষ ধাপে আত্ম নিবেদনের মন্ত্রে

আছে আমি সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার সর্বস্ব, আমার দৈহিক কার্যক্ষমতা, আমার জীবন, আমার আত্মা এবং আত্মা বিষয়ে যা কিছু আমার স্ত্রী, গৃহ, সন্তান. সন্ততি, আমার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি আমার সমস্ত বস্তুসম্পদ এবং আমার নিজেকে সমর্পণ করিতেছি।

এই মন্ত্রের ভিত্তি গীতা নবম অধ্যায় ॥ রাজবিদ্যা ॥ শ্লোক ২৭ ॥ অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম।

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়। তুমি যাহাই কর. যাহাই খাও. হোম, যাগ যাহাই কর যাহাই দান কর যাহাই তপস্যা কর সবই আমাতে সমর্পণ করিও।

বল্লভাচার্যের সর্বপ্রধান শিষ্যদের মধ্যে আটজনকে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখার অবতার আখ্যা দিয়েছিলেন এর মধ্যেও গীতার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় কেননা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপেই অন্তরঙ্গভাবে লাভ করেছিলেন।

স্পষ্ট বোঝা যায় বল্লভাচার্যের ভক্তিসাধনার ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবত গীতা।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিগ্রহ ও পীঠস্থান

বিগ্রহ	পীঠস্থান
শ্রীনাথজী	নাথদ্বার ॥ রাজস্থান
শ্রীনবনী প্রিয়জী	নাথদ্বার ॥ রাজস্থান
শ্রীমথুরেশজী	জয়পুর ॥ ব্রজ, উত্তরপ্রদেশ
শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী	নাথদ্বার ॥ রাজস্থান
শ্রীদ্বারকানাথজী	কঙ্কোরলী ॥ রাজস্থান
শ্রীগোকুলনাথজী	গোকুল ॥ ব্রজ, উত্তরপ্রদেশ
শ্রীবালকৃষ্ণজী	সুরাট ॥ গুজরাট
শ্রীমুকুন্দরায়জী	বারাণসী ॥ উত্তরপ্রদেশ
শ্রীমদনমোহনজী	কামবন ॥ রাজস্থান
শ্রীগোপীনাথজী	ডেরাগাজী খান ॥ সিন্ধুপ্রদেশ, বর্তমান বৃন্দাবন

অষ্টছাপ পরিচয়

পুষ্টিমার্গের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্য গোপালকৃষ্ণের উপাসনাকে তাঁর ধর্ম-সাধনায় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বালরূপের উপরেই জোর দিয়েছেন।

এই সম্প্রদায়ের উপাসনার ভিতরে রাধাবাদকে বল্লভাচার্যের পুত্র আচার্য বিট্‌ঠলনাথ প্রবর্তিত করেছেন বলে কথিত হয়।

হিন্দী অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন সুরদাস, কুম্ভদাস, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দস্বামী, নন্দদাস, ছীতস্বামী ও চতুর্ভুজ দাস এই আটজন কবিই বল্লভাচার্যের "পুষ্টিমার্গ" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং এঁদের বিশ্বাস ছিল বল্লভাচার্য এবং তৎপুত্র বিট্‌ঠলনাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন এবং অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখাসখীর অবতার। হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণ তাঁদের রচনায় মুখ্যভাবে ভাগবতবর্ণিত—লীলাকেই অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের রচনায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গভীর প্রভাব পড়েছে।

অষ্টছাপের প্রায় সব কবিই "রাস নৃত্য" নিয়ে পদ রচনা করেছেন—নন্দদাস বলছেন—

"ইহ অদ্ভুত রস—রাস, কহত কছু কহি নহি আবৈ
সে সহস মুখ গাবৈ অজহু অন্তান পাবৈ"

অর্থ এই অদ্ভুত রাস রসের কথা বলে শেষ করা যায় না, সহস্র মুখে কীর্তন করলেও এর অন্ত পাওয়া যাবে না।

কুম্ভনদাস রাস নৃত্যের বর্ণনায় বলছেন—

"বিমোহী ব্রজনারি, পসু পংখিসুনৈ
দৈ ধরি কান।
চরস্থির হো ফিরত চল
সব কী ভই গতি আন॥
তজি সমাধি জু মুনি রহে,
থকে ব্যোম বিমান আকার—
দেখি কৌতুক চন্দ্র ভুল্যো
তেজি পশ্চিম—চাল।

অর্থাৎ রাস নৃত্য দেখে পশুপাখী মুগ্ধ, সকলের গতি স্থির, রাসনৃত্য দর্শনে মুগ্ধ

মুনির সমাধি হয়েছে ভঙ্গ, আকাশ বাতাস স্তব্ধ, কৌতুক দেখে চাঁদও পশ্চিমে যেতে ভুলে গেছে। চতুর্ভুজ দাস রাসনৃত্যের বর্ণনায় বলছেন—

চতুর্ভুজ প্রভু শ্যাম শ্যামাকী নটনি দেখি,
মোহে খগমৃগ বন, থকিত ব্যোম বিমান।

অর্থ চতুর্ভুজ প্রভু শ্যাম শ্যামার নৃত্য দেখছেন,—নৃত্য দেখে পশু পাখী সকলেই মুগ্ধ, আকাশ বাতাস স্তব্ধ।

গোবিন্দ স্বামী রাসনৃত্য বর্ণনায় বলছেন—

সিব বিরঞ্চিত মোহে সুর সুনি সুনি
সুর নর মুনি গতি ভঙ্গে॥

অর্থাৎ রাসনৃত্যের সঙ্গে যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে, তাই শুনে শিব বিরিঞ্চি মুগ্ধ। সুর, নর, মুনি সকলের গতি স্তব্ধ।

অষ্টছাপের কবিরা গোপী প্রেমকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন—

সুরদাস গোপী প্রেম বর্ণনা করছেন—

"হম অহীরি গৃহ নারি
লোক লজ্জা কে জোরী
তা দিন হম ভই বাবরী
দিয়ো কণ্ঠ তেঁ হার।
তবতে ঘর ঘৈরা চল্যো
"শ্যাম তুমহারো জার।"

"আমি আহেরী, গৃহ নারী, লোক লজ্জা বিসর্জন দিয়ে উন্মাদিনী, দিলাম তোমাকে আমার কণ্ঠহার, এখন সর্বত্র রটনা—

"শ্যাম তোমার জার॥"

পরমানন্দ গোপী প্রেম বর্ণনা করছেন—

গোপী প্রেম কী ধ্বজা
জিন গোপাল কিয়ো বল আপনে
উর ধরি শ্যাম ভুজা
শুক মুনি ব্যাস প্রশংসা কীনী,
উধো সন্ত সরাহী
ভূরি ভাগ্য গোকুল কী বনিতা
অতি প্রণীত ভব মাঁহী॥

গোপী প্রেমের ধজা: যে শ্যামকে বুকের উপর আলিঙ্গনবদ্ধ করে প্রেমের বশ করতে পেরেছে। শুক, মুনি, ব্যাস সবাই গোপী প্রেমের প্রশংসা করে, উদ্ধব গোপীপ্রেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গোকুল বনিতা এই ভবে অতিশয় পুণ্যবতী অষ্টছাপ কবিদের পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রভাবের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরদাস রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন,—

আবত হী যমুনা ভরে পানী।
শ্যাম বরণ কাহুকো ঢোঁটা,
নিরখি বদন ঘর গঙ্গ ভুলানী
উন মো তন মৈ উন তন
চিতয়ো তরহী তে, উন হাথ বিকানী।
উর ধকধকী টক টকী লাগী তনু ব্যাকুল
মুখ করত ন বাণী॥

অর্থ— জল নিতে এসেছিলাম যমুনায়—শ্যামবর্ণ সে
কাদের ছেলে—মুখ দেখে ভুলে গেলাম
ঘরে ফেরার কথা, সেই থেকে আমার
সব দেহে মনে তার চিন্তা—তার
হাতেই বিকিয়ে গেলাম, আমার বুকে
ধকধকী আঁখি স্থির, তনু ব্যাকুল
মুখে আর বাণী ফুরেনা॥

নন্দদাস অতি সুন্দর পদে রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন—

কৃষ্ণনাম ভাব তৈ সুন্যো রী আলী,
ভূলী রী ভবন হো তে বামরী ভঈ রী।
ভরিনভংর অববৈ নৈন চিত হু ন পবৈ চৈন
তন কী দসা কছু উরে ভঈ রী।
জেতিক নেম ধর্ম ব্রত কীয়ে রী, মৈ বহুবিধি,
অংগ অংগ ভঈ মৈ তো শ্রবণ মঈরী।
নন্দদাস জাকে শ্রবণ সুনে ঐসি গতি,
মাধুরী মুরতি কৈধী কৈসী দই রী॥

অর্থ— সখিরে ! যখন থেকে শুনেছি সেই কৃষ্ণনাম
তখন থেকেই ভুলেছি গৃহ সংসার, হয়েছি উন্মাদ। নয়নে
কেবল ভরে আসে জল, প্রাণে নেই শান্তি, দেহের দশা হয়ে
গেল কেবল অদ্ভূত রকম। যত না করেছিলাম ব্রত নিয়ম সব গিয়ে
এখন সর্ব অঙ্গ হয়ে গেল শ্রবণময়ী। নন্দদাস বলে—যার নাম
শুনে হয়েছি এমন তার মধুর মূর্তি—না জানি সে কি অদৃষ্ট।

পরমানন্দের একটি বিরহের পদে রাধা ভাবের প্রেম ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে—

যা হরি কো সংদেন ন আয়ো।
বরস মাস দিন বীতন লাগে
বিন্থ দরসন্থ দুখ পায়ো॥
ঘন গরজ্যো পাবস ঋতু প্রগটি
চাতুক পীউ সুনায়ো।
মত্ত মোর বন বোলন লাগে
বিরহিন বিরহ জানায়ো॥
রাগ মল্হার সহয়ো নহি জাঈ
কাহু পথিকহি গায়ো।
পরমানন্দ দাস কহা কী জে
কৃষ্ণমধুপুরী ছায়ো॥

অর্থ—এলো নাজেহরির কোন সংবাদ। বরষ, মাস, দিন গেল চলে, বিনা দর্শনে আর্ত হল হৃদয় বেদনায় গর্জন করে মেঘ, সুরু হল বর্ষণ, পিউ পিউ রব শোনায় চাতক, মুখর হল বনস্থলী মত্ত ময়ূরের কেকারবে—বিরহিণীকে বিরহ দিল জানিয়ে। মল্লার রাগ সহ্য হয়না, কেন পথিক গায় এই গান।

পরমানন্দ দাস বলে কৃষ্ণ॥ বিরহের কালো ছায়া। মধুপুরী ফেলেছে ছেয়ে।

কুম্ভনদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অতি সুন্দর শৃঙ্গাররসের পদ রচনা করেছেন—

কাহে তে আজ বিথুরী প্যারী
কৈঁও ন বাঁধহি অলক
ভোঁহ কমান, নৈন রতনারে
মানৌ ন লাগীয়ে পলক।

রতিরস কী ঝুলি জনা বতি
মদ গয়দ কী চাল চলক
কুম্ভনদাস মিলো গিরিধর কো
মানো কোটি চান্দ কী ঝলক ॥

অর্থ—কে গো এমন আলু থালু বেশে প্যারী, কেন গো বাঁধ নাই অলক? নিদ্রাহীন বুঝি কাটালে নিশি, নয়নে বুঝি পড়েনি পলক। মদরসে ভরা চলনে তোমার জানায় রতিরসের ভোর, কুম্ভনদাস কয় গিরিধরের সঙ্গে মিলন, সে তো যেন কোটি চাঁদের ঝলক।

অনুবাদ—লেখিকা

মীরাবাঈ

অষ্টছাপের কবিগণের প্রায় সমকালবর্তিনী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি—মীরাবাঈ সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাতে দেখা যায় বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় কোনো গোস্বামী (রূপ গোস্বামী) র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবের আদান প্রদান হয়েছিল। কিন্তু মীরাবাঈ এর কবিতার ভিতরে যে প্রেমধর্মের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুরূপ কোনো বৃন্দাবনের যুগল লীলাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মীরাবাঈ স্বাধীন ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে আরাধনা করেছিলেন—ঐ কথা তাঁর পদে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল,
দুসরান কোই,
জাকে সির মোর মুকুট
মেরো পতি সোই ॥

অর্থ—একমাত্র গিরিধর গোপাল ছাড়া আমার আর কেউ নেই, যাঁর মাথায় শিখি পাখার মুকুট, আমার পতি তিনিই। মীরাবাঈ নিজেই রাধা—ভক্ত প্রেমিকা, তিনি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না বলে এবং সব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব তাঁর গৃহে স্থান পেত বলে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের অষ্টছাপের কৃষ্ণদাস মীরার সঙ্গে এক গৃহে বাস করতে অসম্মত হন।

মীরাবাঈ এর অধিকাংশ পদে বিরহের ভাব এবং প্রিয়তমের অদর্শন জনিত বেদনার্ত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। মীরাবাঈ এর রচিত পদগুলিতে যে

রোমান্টিক কাব্য মাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া যায়, তা অন্যান্য হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় বিরল।

ময়না লাল চাওত, জিয়ারা উদাসী,
শ্যামল বনমে বাজো শাওন কী বাঁশী
নয়না মে ময়না মেরা নয়না না লাগে
প্রীতম কী শ্বাস আওয়ে কুসুম সুবাসী ॥

অনুবাদ—নয়ন লোভাতুর, হিয়া যে উদাসী
শ্যামল বনেতে বাজে শাওনের বাঁশী।
স্বপন বিভোর নয়ন আমার, অনিমেষে রহে জাগি
প্রীতমের শ্বাস বহে আনে কুসুম সুবাসী ॥

অনুবাদ—লেখিকা

শুনি ম্যয় হরি আওন কি আওয়াজ
দাদুর মওর পাপিহা কোলো
কোয়েল কুসুমে সাজ
বরষে বাদরওয়া মেহা গরজে
দক্ষিণ ছোড়ি লাজ ॥
ধরতি রূপ ন ওয়ন নওয়া ধরি রূপ
পিয়া মিলন কি কাজ
মীরা চিত ধীর না মানে
বেগ মিলো মহারাজ ॥

অর্থ—চরণের ধ্বনি শুনি যেন বাজে
বুঝি ঐ হরি আসে।
দাদুর ময়ূর পাপিয়া ডাকিছে
কোয়েল কুসুম সাজে ॥
বরষে বাদল, গরজিছে মেঘ,
দামিনী ছেড়েছে লাজ।
রূপ ধরে নব ধরণী নব রূপে
পিয়া মিলনের কাজ।
মীরা চিত আর ধীর নাহি মানে
ত্বরা করি এসো ওগো মহারাজ।

অনুবাদ—লেখিকা

উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম

অষ্টছাপ কবিদের প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যায়ও পঞ্চসখা সম্প্রদায় বলে একটা ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। অচ্যুতানন্দ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। এঁরা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে কাব্য রচনা করেন নি। এঁদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হলেন শূন্যমূর্তি, শূন্যপুরুষ এঁদের সাধন পদ্ধতিতে নাথ সম্প্রদায়ের অনুরূপ কায়া সাধনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাস জীবনের অধিকাংশ সময় উড়িষ্যার পুরীধামে কাটালেও চৈতন্য সম্প্রদায় ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ওড়িয়া সাহিত্যের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন ওড়িয়া কবির কাব্যে রাধাসহ কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য দেখা যায়। এর ভিতরে অভিমন্যু সামন্ত সিংহারের বিদগ্ধ চিন্তামণি কাব্য উল্লেখযোগ্য। কবি অভিমন্যু রাধিকাভক্ত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভক্ত কবি হলেও তাঁর সমগ্র কাব্যে যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যই অনেক জায়গায় বড় হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা অধ্যায়ে তিনি বিশেষ কোনো প্রকারের যমক বা অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন, কোথাও বা প্রত্যেক চরণের আদিতে একটা বিশেষ বর্ণ নিয়ে অনুপ্রাস রচনা করেছেন।

কবি অভিমন্যুর রাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনা বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিদেরই অনুরূপ। প্রথমে সখা সখীর মুখে নাম শুনেই রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ—

যা নাম স্বাদু লোভে মানসরত।
তা রূপ হোইসিব সুধারস ত যে।
বিদগ্ধ চিন্তামণি, নবম ছন্দ

নাম শুনে পাগল হবার পর শ্রীমতীর চিত্রপট দর্শন। তার পরে রাধার ভাবদশা। এই ভাবেই শ্রীরাধার উত্তরোত্তর প্রেমের গভীরতা বর্ণিত হয়েছে।

রাধা অবলম্বনে ওড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের কৃপাসিন্ধু পণ্ডিতের প্রেম পঞ্চামৃত এবং দেব দুর্লভ দাসের রহস্য মঞ্জরীরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

গুজরাটে ভাগবতধর্ম : বৈষ্ণব কবি নরসিংহ মেটা, "বসন্তবিলাসে" বৈষ্ণব প্রভাব

মহাভারতের নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু বেদ-প্রসিদ্ধ বিষ্ণু দেবতার অবতার, তাই নন, তিনি সর্ব ভারতীয় ভাগবতধর্মের প্রথম প্রচারক। মহাভারতের এই কৃষ্ণের বাসস্থান দ্বারকা বলে বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে দ্বারকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার নৃপতি ছিলেন, বহু বৎসর এই স্থানেই রাজত্ব করেন এবং এই স্থান থেকেই তিনি পাণ্ডব কৌরবের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সাহায্য করেন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকা এবং দ্বারকাবাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। দ্বারকা সম্বন্ধে এই জনশ্রুতির পেছনে কি আছে, বলা যায় না, কেননা এ সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না এবং কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্বারকার অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

গুজরাটের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মধ্যদেশে (মেবারে) ভাগবতধর্মের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে। এই সময়ে মেবারে একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সম্ভবত এই স্থান থেকেই গুজরাটে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। গুজরাটে বৈষ্ণব ধর্মের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাপেক্ষ তারিখ অবশ্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। এই সময়ে ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সম্রাটেরা ভাগবত ধর্মে বিশ্বাসী পরম ভাগবত ছিলেন বলেই তাঁদের অধিকৃত রাজ্যসমূহে ভাগবতধর্ম বিস্তারের প্রয়াসী ছিলেন। সম্ভবত এই সময়েই সুরাষ্ট্র নামক উপদ্বীপে (বর্তমান কাথিয়াবাড়ে) বৈষ্ণবধর্ম অনুপ্রবেশ করে। জুনাগড়ের কাছে অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তিগাথায় এর নিদর্শন মেলে। এই অশোক স্তম্ভের উপরেই আর একটি লিপি মুদ্রিত পাওয়া যায়। এর তারিখ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। এই লিপিটিতে "সুদর্শন" নামক দীঘির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই দীঘি খনন করেন চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে। সম্রাট অশোক এই দীঘির আয়তন বাড়ান এবং পুনরায় এর সংস্কার করেন—রুদ্রদাম। ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত নিযুক্ত সুরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পুনরায় এই দীঘির সংস্কার করেন। সুদর্শন দীঘির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মুদ্রিত শিলালিপিতে

আর একটি তথ্যের উল্লেখ এই সঙ্গে পাওয়া যায়,—সেই তথ্যটি একটি মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে। এই লিপিতে আছে—একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং সেটি চক্রধর কৃষ্ণকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং এই কৃষ্ণই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। এই মন্দির নির্মাতা আপনাকে গোবিন্দচরণে উৎকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। এই মন্দিরটিই সম্ভবত সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের প্রথম বৈষ্ণব মন্দির।

পরবর্তী শতাব্দীতে সৌরাষ্ট্র গুপ্তরাজাদের শাসনমুক্ত হয়ে "বল্লভী"দের শাসনে আসে। এই রাজবংশের অধিকাংশই শৈব ছিলেন। এঁদেরই মধ্যে একজন, সর্বপ্রথম একটি শিলালিপিতে নিজেকে "পরমভাগবত" বলে বর্ণনা করেন, এই শিলালিপিটি ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের।

প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত গুজরাটে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার দেখা যায় না। দশম শতাব্দীতে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় যে গুজরাটে এবং সৌরাষ্ট্রে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তৃত হচ্ছিল। দু তিন জায়গায় বৈষ্ণব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই জায়গাগুলি—"কদ্র" (গুজরাটের তৎকালীন রাজধানী, অনহিলপুর পত্তন থেকে ১৫ মাইল দূর) এবং (২) মধেরা।

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া যায়, সেগুলি থেকে জানা যায় যে এইসব জায়গায় পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল এখানে বিষ্ণুর সব অবতারই পূজিত হতেন এবং এঁদের সঙ্গে ব্রহ্মা ও মহাদেবেরও পূজা হত। এই সব তথ্য দ্বাদশ শতাব্দীর প্রমাণ সম্বলিত বিবরণ থেকে পাওয়া যায় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই সব বিবরণ আগে বেশী পাওয়া যায় এবং দেখা যায় সুদূর ব্যবধান যুক্ত প্রদেশগুলিতে ব্রোচ, ভেরাভল, পোরবন্দর, জুনাগড়, পলানপুর, বদনগর ইত্যাদিতে বিষ্ণুপূজা প্রচলিত ছিল।

গুজরাটে বিষ্ণুপূজা থেকে কৃষ্ণ পূজার প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় একটি শিলালিপিতে। এই শিলালিপিতে একটি দানের উল্লেখ আছে। দানকর্তা মহাস্তপেঠড় বাঘেলা শারঙ্গদেবের অধীনস্থ রাজকর্মচারী, পলানপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর দানের উদ্দেশ্য ছিল একটি মন্দিরে পূজা অব্যাহত রাখার। এই শিলালিপির বিবরণের প্রথমে জয়দেবের "গীত গোবিন্দে"র প্রারম্ভিক শ্লোক উৎকীর্ণ আছে এই শিলালিপির বিস্তৃত বিবরণ—

The Indian Antiquary' (The Journal of Oriental Research) Vol. 41, February 1912. P—20.

প্রকাশিত হয়েছিল—"The Ananda Stone Inscription of Sarangadeva, Vikram Samvat 1348, This inscription was found early in 1904, when some excavations were being carried on by the Irrigation Dept. of the Baroda State at Anavada, the old Anahilapataka nearly three miles from patan in the Khadi Division.

The characters are Nagri, the language is Sanskrit.

The Inscription opens with the well known stanza, with which Jaydeva's Gitagovinda Commences. Then follows the date, which is Sunday the 13th of the bright half of Ashada in the Vikram Year 1348. At that time Maharajadhiraj Sarangadeva was reigning at Anhitvataka, his Mahasandhi Vigrahika, Mahamatya Madhusudana was doing all the business of the seal, relating to the drawing of documents etc. and the Panch (Pancha Kula) consisted of Mahanta Pethada being appointed by the king as keeper of the seal at Palhanpur (Palanpur), The Inscription then proceeds to record the gifts that were made on the aforesaid date as well as previously for the worship, offering and theatricals before the God, Krishna.

The fact, that the stanza is quoted as the invocatory verse in the Inscription, shows that the work had already within a century become quasi-sacred. Again it appears from this Inscription, that there was a temple of Krishna existing in Anavada long before the time of kind sarangadeva to whose reign it refers itself and who, no doubt, belonged to the Baghela dynasty."

গুজরাটে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের নিদর্শন মেলে দ্বারকা এবং ডাকোরের দুটি সুবৃহৎ কৃষ্ণ মন্দিরে।

যদিও বর্তমানে যে স্থানকে "দ্বারকা" বলা হয়, সে স্থানটি মহাভারতে উল্লিখিত

দ্বারকা নয়, তবু বর্তমানে দ্বারকার কৃষ্ণ মন্দির সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে এবং আর্যাবর্তের প্রধান প্রধান চারিটি তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। দ্বারকার এই মন্দির কবে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, তাই নিয়ে মতবিরোধ আছে। গুজরাটী পণ্ডিত তনসুখরাম ত্রিপাঠির মতে ১২০০ শতাব্দীর পরে।

ডাকোরে আর একটি পৌরাণিক বিষ্ণুর মন্দির আছে, এই মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহ "রণছোড়জী" নামে প্রসিদ্ধ। গুজরাটে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং এই সময়েই জাতীয় ধর্ম হিসাবে বৈষ্ণবভক্তি ধর্মের ব্যাপক প্রচার সুরু হয়। গুজরাটে এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন নরসিংহ মেটা এবং তিনি নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্য ও বল্লভাচার্যের পূর্ববর্তী ছিলেন

নরসিংহ মেটাকে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের "হেরাল্ড" বা অগ্রদূত বলা হয়। নরসিংহ মেটার জন্ম তারিখ অনুমান করা হয়েছে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিনি নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্যদেব ও বল্লভাচার্যের পূর্ববর্তী।

কাথিয়াবাদের জুনাগড়ের নিকটে তালজা নামক গ্রামের এক প্রসিদ্ধ শৈব ব্রাহ্মণবংশে নরসিংহ মেটার জন্ম হয়। কিংবদন্তী অনুসারে ভ্রাতৃজায়ার তাড়নায় গৃহ থেকে বিতাড়িত নরসিংহ শিবের আরাধনায় কঠোর তপস্যা করে শিবের নিকটে এক অদ্ভুত বর লাভ করেন। এই বরের প্রভাবে নরসিংহের আত্মা দ্বারকার কৃষ্ণ মন্দিরে উপনীত হয়, এবং তিনি এক অলৌকিক স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের "রাসলীলা" দর্শন করেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর থেকেই নরসিংহ মেটা কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় জীবন উৎসর্গ করেন। নরসিংহ মেটা কাব্যরচনায় সর্বাধিক অনুপ্রেরণা পান ভাগবত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে।

নরসিংহ মেটা শৃঙ্গার মালায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রণয়রসাত্মক অনেক পদ রচনা করেছেন। একটি উদাহরণ—

সাঁচু বোলো শ্যামলিয়া ওহালা
কহো কাঁয়া গয়া তার রে।
মানী তীনে ভবন ত্যজিনে।
কোনে মহোল রহয়া তার রে॥

আজ রজনী রড়্তা বীতি
কন্থ বিনা ক্যম রহিয়ে রে।
তল পপড় থমি রজনী গাড়ি
এঁউ থায় তে কাম্ সহিয়ে রে॥
চম্পা কেত উতায়রুচরঙ্গী
পেলী নওল নারস্ত মন মোহিউ রে।
তমো বিনা অমো তলসি মরিয়ে
তোল তলাক রোইউ রে॥

বাংলা অনুবাদ—লেখিকা

সত্য বল শ্যামল প্রিয়
কোথায় তুমি গিয়েছিলে
ত্যাগ করে এই প্রিয়ের ভবন
কার মহলে রয়েছিলে
কাটল নিশি চোখের জলে
কান্ত বিনা রহি কেমনে রে।
ছটফটি হায় রজনী পোহাই
এমন হলে সহি কেমন করে
পড়ল ভাঁটা প্রেমে আমার
মন পেল ঐ নতুন মেয়ে
আমরা ঝুরি তোমার লাগি
তোমার চরিত বুঝন্থ এবার॥

গুজরাটী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য "বসন্ত বিলাসে" জয়দেবের গীত-গোবিন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বসন্ত বিলাস প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্যের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন বসন্ত বিলাসের যে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেছেন এবং তার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায় বসন্ত বিলাস বসন্ত ঋতু-উৎসব বিষয়ক কাব্য। এতে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই ঋতুতে কামদেবের প্রভাব এবং যুবক যুবতীর প্রণয় তৃষ্ণা, বিরহ, মিলনের অনুভূতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বসন্ত ঋতু-উৎসব বর্ণনা এবং অনঙ্গদেবের মহিমা

বর্ণনা গুজরাটী কবিদের অতি প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল, এবং এই বিষয় নিয়ে বহু কাব্য রচিত হয় এবং এই সব কাব্যকে "ফাগু" নামক একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফাগু কথাটা এসেছে সংস্কৃত "ফল্গু" কথাটি থেকে যার অর্থ দোলের "আবীর"। ফাগু শ্রেণীর কাব্যের সঙ্গে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই তবে গুজরাটের জৈন সম্প্রদায় ফাগু শ্রেণীর কাব্যকেও তাঁদের ধর্ম সাহিত্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ব্যক্তি বা নায়ক ছিলেন চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর যাঁরা জাগতিক সুখ ভোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সংসারে পুনর্জন্মের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। এবং এই জ্ঞানই তাঁরা নরলোকে প্রচার করবার প্রয়াসী ছিলেন। এই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে বাইশ সংখ্যক নেমিনাথ রাজপুত্র ছিলেন। গল্প আছে, রাজকুমারী রাজমতীর সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয় বসন্তকালে। বধূবেশে সজ্জিতা অপূর্ব রূপবতী কন্যা বিবাহ বাসরে অপেক্ষা করেছিলেন, নেমিনাথ রওয়ানা হয়েছিলেন কন্যার উদ্দেশ্যে হস্তী পৃষ্ঠে। যাত্রা পথের পাশে তিনি দেখলেন কতগুলি পশুকে খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হয়েছে এবং তারা তীব্র আর্তনাদ করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন তাঁর বিবাহে ভোজের জন্য এদের বলি দেওয়া হবে। পশুদের দুঃখে বিদীর্ণ হৃদয় নেমিনাথ ফিরে চললেন। বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য শোভা, তুলনাহীনা রূপ-লাবণ্যবতী বধূ কিছুই তাঁর পথ রোধ করতে পারল না। চলে গেলেন তিনি —প্রব্রজ্যা নিয়ে পারমার্থিক তত্ত্ব অন্বেষণের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়। নেমিনাথ সম্পর্কে এই গল্প বহু জৈন ফাগুর বিষয়বস্তু।

"ফাগু" শ্রেণীর কাব্যের উৎস সন্ধান করা যায় কালিদাসের ঋতুসংহারের মধ্যে চারশ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।

কালিদাসের পরে বহু কবি সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বসন্ত ঋতুর বর্ণনার সঙ্গে নরনারীর প্রেম, প্রণয় এবং মিলন, বিরহের বিচিত্র অনুভূতি মিশিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। এই সব কাব্যে রূপবর্ণনা, চিত্র পরিকল্পনা অনুভূতি ও নানা অবস্থা বর্ণনায় কতগুলি মামুলি প্রথানুসৃতি এসে গিয়েছিল।

যেমন অশোক তরুর বর্ণনা—পুষ্পবিকাশের জন্য নারীর পদাঘাতের একান্ত আবশ্যকীয়তা "অশোক তরু উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।" —রবীন্দ্রনাথ

এইসব "ফাগু" শ্রেণীর কাব্যের শ্রোতারা ছিলেন রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজ-অমাত্য পরিষদেরা, শহরের ধনী সম্প্রদায়—নগর ফেরী এদের আচার-

ব্যবহার, বসন ভূষণ সবই কৃত্রিমতায় পূর্ণ। বিলাস ব্যসন এবং সর্বপ্রকার ঐহিক সুখভোগই ছিল এঁদের কাম্য। অনঙ্গ রঙ্গে রতি সুখোৎপত্তির ইন্দ্রিয়জ চেষ্টাতে বা কেলিবিলাস বর্ণনায়ই ছিল এঁদের অধিকতর আনন্দ।

এই পরিবেশে বসন্ত বিলাস রচিত হলেও এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিষয়বস্তুর এবং বর্ণনার কবিত্বে সংস্কৃত কাব্য থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ছিল অনেক পরিমাণে।

বসন্ত বিলাসের প্রথম শ্লোক সরস্বতীর বন্দনা গীতি। তারপর ২—৭ শ্লোক বসন্ত ঋতুর বর্ণনা। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এক যুবক যুবতীর প্রেম, মিলন, বিরহ, মান, প্রণয়-কলহ, প্রণয়-ভর্ৎসনা ইত্যাদি প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি একটা ক্ষুদ্র আখ্যান আকারে বর্ণিত হয়েছে। বসন্তবিলাসের যে পুঁথি নর্মান ব্রাউন আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে গুজরাটী ভাষায় শ্লোকের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত শ্লোক আছে। এই কাব্যের দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়—একটা ৮৪ শ্লোকের, অপরটি কিছু কম—৬৬ শ্লোকের। দুটি সংস্করণের সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকে মিল নেই।

অধ্যাপক নর্মান ব্রাউনের বিবরণ অনুসারে গুজরাটী ভাষায় রচিত আদি বসন্ত বিলাস কাব্যে ৫০, ৫২টি মাত্র শ্লোক ছিল, এবং এগুলির সঙ্গে কোনো সংস্কৃত বা প্রাকৃত শ্লোক ছিল না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে গুজরাটী "বসন্ত বিলাস" এক জনের রচনা নয়। অনেক কবির অনেক রচনা এর মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। গুজরাটী বসন্ত বিলাসের রচয়িতা সম্বন্ধে যেমন কিছু জানা যায় না, এর রচনাকাল সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। নর্মাণ ব্রাউনের আবিষ্কৃত পুঁথি আসল, পুঁথির একটা নকল এই পুঁথির শেষে যিনি নকল করেছেন—তাঁর নাম দেওয়া আছে—চন্দ্রপাল সাহ এবং তারিখ দেওয়া হয়েছে—বিক্রম সংবৎ ১৫০৮, অর্থাৎ ১৪৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ। গুজরাটী বসন্ত বিলাসের পুঁথির যে নকল পাওয়া গেছে, তার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট চিত্রাবলী। জৈন ধর্মীয় সাহিত্য, "কল্পসূত্রে"র পাণ্ডুলিপিগুলি অঙ্গ হিসাবে তাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট যে চিত্রাবলীর জন্য বিখ্যাত, "বসন্ত বিলাস" একমাত্র ঐহিক বিষয়ক কাব্য, যার পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই ধরণের চিত্রাবলী সন্নিবিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এবং বসন্ত বিলাসের পুঁথির মধ্যে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি থেকে এর রচনাকাল সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যায়।

নর্মান ব্রাউন বসন্ত বিলাসের পুঁথির যে নকলটি আবিষ্কার করেন সেটা

আহমেদাবাদে প্রস্তুত হয়েছিল, কুতুবউদ্দিনের রাজত্বকালে। কুতুবউদ্দিনের পিতা আহমদ শাহ সবরমতী নদীর ধারে তাঁর রাজধানী নির্মাণ করে নিজের নামে নাম দেন আহমেদাবাদ। এক শতাব্দী ধরে আহমেদাবাদ সৌধকিরীটিনী এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠে এবং হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের একটি অতিশয় বিত্তশালী বাসস্থানে পরিণত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আহমেদাবাদ বস্ত্র নির্মাণ শিল্পের একটা প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে, আহমেদাবাদে প্রস্তুত সব পাণ্ডুলিপিই কাগজের উপর নকল করা। তালপাতার চেয়ে কাগজে পুঁথি নকল করার সুবিধা ছিল অনেক বেশী। কাগজে পুঁথি নকল করলে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করা যেত এবং ছবি আঁকার কাজ খুব ভালো হত।

অধ্যাপক নর্মান ব্রাউনের বিবরণ অনুসারে বসন্ত বিলাসের পুঁথি সবখানি পাওয়া যায়নি, যেটুকু পাওয়া গেছে, সেটুকু ৩৬ ফুট লম্বা। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পুঁথি নকলের জন্য তালপাতার চেয়ে কাগজের চাহিদা বাড়ে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাটেই সর্বপ্রথম পুঁথি নকলের জন্য কাগজ ব্যবহার করা হতে থাকে। কাগজ সম্ভবত পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষে আমদানী করত।

প্রভূত ধনশালী বণিক সম্প্রদায়ের বাসস্থান আহমেদাবাদে বিত্তশালী নাগরিকদের মধ্যে "ফাগু" কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ছিল না কিন্তু "বসন্ত বিলাস" যে সাধারণ "ফাগু" কাব্যের মত ছিল না, পুরোপুরি ধর্মসাহিত্য না হলেও উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠের প্রমাদগুণ যে এর মধ্যে যথেষ্ট ছিল, সেটা প্রমাণিত হয় এই কাব্যের শেষে হিতোপদেশের একটি শ্লোকের উল্লেখে।

চন্দ্রপাল সাহ নিজে আবৃত্তি করবেন বলে "বসন্ত বিলাস" নকল করিয়েছিলেন এবং হিতোপদেশের শ্লোক উল্লেখ করে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—

"গীতশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম
ব্যসনেন হি মূর্খাণাম কলহেন চ নিদ্রয়া"

॥ শারঙ্গ ধরপদ্ধতি ২০২ ভূমিকা—হিতোপদেশ ॥

অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞানবান, তাঁরা গীত, শাস্ত্র ইত্যাদির চর্চায় কালযাপন করেন, আর যারা মূর্খ তারা যত রকম পাপকার্য, নিদ্রা ও কলহে কাল কাটায়।

গুজরাটের রাজবংশের মধ্যে চালুক্যবংশে ৯৬১/৪২ থেকে ১২৪৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কুমার পাল (১১৪৪-১১৭৩)

মহাজ্ঞানী জৈন সন্ন্যাসী হেমচন্দ্র কর্তৃক জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু তার পরেই "বাঘেলা" বংশ গুজরাটে রাজত্ব করেন ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই বাঘেলাবংশ বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নর্মান ব্রাউন বসন্ত বিলাসের পুঁথির যে নকল আবিষ্কার করেছেন, তার তারিখ দেওয়া আছে ১৫৫১/৫২ খ্রীষ্টাব্দ, "জয়দেবের গীতগোবিন্দের" খ্যাতি তখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং "বসন্ত বিলাসের"র এই পুঁথির মধ্যে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকের দু-চারটি শ্লোকে গীতগোবিন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বিদ্যাপতির একটি শ্লোকের প্রায় হুবহু অনুবাদ পাওয়া যায়, একাধিক স্থানে রাসনৃত্যের উল্লেখ আছে।

বসন্তবিলাস ॥ শ্লোক—১২ ॥

পরাউ মদন মহীপতি দীপতি সহং ন জাই।

করই নবী পরি যুগতি রে জাগতি প্রতাপ ন মাই ॥

মদন মহান্ নৃপতি, তার তেজ সহ্য করা যায় না। তিনি যেন একটি নূতন নক্ষত্রপুঞ্জের সমাবেশ তার মহিমা পৃথিবী ধারণ করতে পারে না।

গীতগোবিন্দ ॥ প্রথম সর্গ, শ্লোক ৩১ ॥

মদন মহীপতি কনকদণ্ডরুচি কেশর কুসুম বিকাশে

মিলিত শিলী মুখ পাটলি পটলকৃত স্মরতূন বিলাসে ॥

এই বসন্ত ঋতুতে কামদেব নরপতিরূপে বিরাজমান, প্রস্ফুটিত নাগকেশর কুসুম সমূহ উহার স্বর্ণচ্ছত্র এবং ভ্রমর বেষ্টিত পাটলি পুষ্পরাজি উহার বিশাল তূণীর রূপে উপশোভিত।

বসন্ত বিলাস ॥ শ্লোক—৪০ ॥

চীন্ত হরই নবি চন্দন চন্দ নহী মনোহরা—

চন্দন আমার উৎকণ্ঠা দূর করতে পারে না, চন্দ্র আমার কাছে মনোহর নয়।

গীত গোবিন্দ ॥ চতুর্থ সর্গ, শ্লোক ১ ॥

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।

চন্দন এবং চন্দ্রকিরণকে নিন্দা করিতেছেন, শোকে অধীর হইয়া

বসন্ত বিলাস ॥ শ্লোক ৪০ ॥

উরবরি হার তে ভার মু সমরী শৃঙ্গার অঙ্গার—

বক্ষোপরি আমার কণ্ঠহার যেন ভারী বোঝা, আমার অঙ্গের অলঙ্কার সমূহ যেন জলন্ত অঙ্গার।

গীতগোবিন্দ ॥ ৪র্থ সর্গ, শ্লোক ১১ ॥

স্তন বিনিহিত হারমুদারম্ সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।

তিনি এতই কৃশাঙ্গী হইয়াছেন যে বক্ষোপরি কণ্ঠহার তাহার নিকট ভার বোধ হইতেছে।

বসন্ত বিলাস ॥ শ্লোক ২১ ॥

বসন্তে বাসন্তীক্রম কুসুম সৌরভ্যলহরী
ভ্রমদ্ ভৃঙ্গী রচিত বহুলারাব মুখরে
প্রিয়ম্ স্মৃত্বানাথাম্ বিরহবিধুরো মন্মথবান্
আহা হাহা হরি হরি মৃতঃ কোঽপি পথিকঃ।

বাসন্তী ক্রমের পুষ্পরাশির সৌরভতরঙ্গের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরদলের গুঞ্জন মুখরিত বসন্তকালে কোনো এক পথিক তার অনাথা প্রিয়তমাকে স্মরণ করিয়া বিরহক্লিষ্ট হইয়া কন্দর্পের শরাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, আহা, হাহা, হরি হরি।

গীতগোবিন্দ ॥ প্রথম সর্গ শ্লোক ২৭ ॥

বসন্তে বাসন্তী কুসুম সুকুমারৈ রবয়বৈ
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিত কৃষ্ণানুসরণাম্॥

বসন্ত ঋতুতে শ্রীমতী রাধা এক দিবস প্রবল মদনবেদনায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বহু যত্নে কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে থাকিলে বাসন্তী কুসুমের ন্যায় তাঁহার সুকুমার অঙ্গ অতিশয় ক্লান্ত ও মদন যন্ত্রণা জনিত চিন্তায় কাতর হয়।

বসন্ত বিলাস ॥ শ্লোক ৩৮ ॥

হারো না রোপিত কণ্ঠে ময়া বিরহ ভীরুণা
ইদানীম্ অন্তরে জাতঃ পার্ব্বতাঃ সরিতোদ্রুমঃ।

আমাদের দুই জনের মধ্যে পাছে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, এই ভয়ে গলায় আমি হার পরি নাই, আজ আমাদের মধ্যে—নদী, গিরি, তরুরাজির ব্যবধান।

বিদ্যাপতি—

চীরচন্দন উরে হার ন দেলা
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা

ব্যবধান সৃষ্টির ভয়ে বুকে চন্দন লেপি নাই, কণ্ঠে হার দিই নাই, সে আজ নদীগিরির অন্তরাল হল।

বসন্ত বিলাসে রাস নৃত্যের উল্লেখ—

নবযৌবন অভিরাম তি রামতি করইং সুরঙ্গি
খণি বিজাহর ভাখর রাস্ রম ইং বরঅঙ্গি

নবযৌবনে অভিরাম তাহারা বিলাসকেলিতে মগ্ন স্বর্গের জ্যোতিষ্মান দেবতাদের ন্যায় তাহারা রূপলাবণ্যবতী রমণীগণের সহিত রাস নৃত্যের আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

শ্লোক—৭০

একি দি ইং সহি তালিয়া তালিয়া চংদিহিং রাস
একি দিং উপালম্ভরে—বালম্ভরহিং সবিলাস

কখনো কখনো যে হাততালি দিয়ে চমৎকার রাসনৃত্যের তাল দিচ্ছে, আবার কখনো স্বামীকে সকৌতুকে জ্বালাতন করছে।

আসামের বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য

আসাম রাজ্যের ইতিহাস

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোম অধিকারের পূর্বে আসামের অধিবাসীদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তার কারণ এর আগের নৃপতিদের কোনো ধারাবাহিক বিবরণ মেলে না, মেলে কতগুলি শিলালিপি এবং চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এগুলিরও আগে কোনো সঠিক তথ্য এখন পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র এবং এই জাতীয় গ্রন্থসমূহে ইতঃস্তত: আসামের অধিবাসীদের সম্পর্কিত উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এইসব নজীর ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে না।

ভারতবর্ষের যে অঞ্চল এখন আসাম নামে পরিচিত, মহাকাব্যের যুগে তাকে বলা হত প্রাগজ্যোতিষ। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের রচনাবলীতে প্রাগজ্যোতিষের অপর নাম কামরূপ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এলাহাবাদে সমুদ্র গুপ্তের শিলালিপিতে কামরূপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর রচনা যোগিনী তন্ত্রে নিম্নলিখিত ভৌগলিক সংজ্ঞা দেওয়া আছে :—

> নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিম্ ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্।
> করতোয়াম্ সমারভ্য যাবৎ দিক্কর বাসিনীম।
> উত্তরস্যাম্ কঞ্জগিরিঃ করতোয়া তু পশ্চিমে।
> তীর্থশ্রেষ্ঠ দীক্ষু নদী পূর্ব্বস্যাম্ গিরি কন্যকে।
> দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লক্ষাবঃ সঙ্গমাবধিঃ।
> কামরূপ ইতি খ্যাত সর্ব্ব শাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥

অর্থাৎ কাঞ্চন অদ্রি থেকে নেপাল পর্যন্ত করতোয়া থেকে দিক্কর বাসিনদী পর্যন্ত উত্তরে কঞ্জগিরি পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে পর্বতকন্যা তীর্থশ্রেষ্ঠ দীক্ষুনদী দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের ও লাক্ষার সঙ্গম এই অঞ্চল সর্বশাস্ত্রে কামরূপ নামে খ্যাত।

এই বর্ণনা অনুসারে প্রাচীন কামরূপ বলতে বোঝাত বর্তমানের আসাম এবং কোচবিহার রংপুর জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর সমেত সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গ।

ইতিহাসে তাই অথবা সান্ জাতির প্রথম আবির্ভাব ইয়ুন্নান প্রদেশে, সেখান থেকে তারা উত্তর বর্মায় প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাই অথবা সান জাতি ইয়ুন্নান প্রদেশের দক্ষিণ দিক থেকে এসে শেওয়ালী

উপত্যকা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এদেরই একটা উপজাতি অহোম ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসামের আদিম অধিবাসীদের আক্রমণ করে এবং তাদের বাসভূমি সম্পূর্ণ অধিকার করে। শান্ জাতির অন্যান্য উপজাতিসমূহ খামতী, ফখিয়াল, নর, আইতোনীয় প্রভৃতি অহোমদের অনুসরণ করে এবং এদের বেশীর ভাগই আসামের পূর্বাঞ্চলে বাস করতে থাকে।

আর্যেরা ঠিক কোন সময় থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন বলা কঠিন, তবে সেটা যে সুপ্রাচীনকাল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারতে আসামের সাংস্কৃতিক ও সামরিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। এই সম্পর্কে নরক কিংবদন্তীটি উল্লেখযোগ্য।

গল্পটি এই :—

বিদেহ নামক দেশের আর্য নৃপতি, জনক নরক নামে একটি বালককে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং নিজপুত্রদের সঙ্গে সমানভাবে লালন পালন করেন। ষোলো বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরক যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতায় রাজপুত্রদের সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন। জনকের মনে ভয় হল যে নরক হয়তো তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নেবে, নরকের ধাত্রী, কাত্যায়নী বিপদের আভাস পেয়ে নরককে নিয়ে জনকের প্রাসাদ ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন এবং গঙ্গা পার হয়ে প্রাগজ্যোতিষে গিয়ে উপস্থিত হন। প্রাগজ্যোতিষ তখন মোঙ্গোল জাতীয় কিরাতদের অধীনে। নরক সৈন্য সংগ্রহ করে কিরাতদের পরাস্ত করেন ও বিদেহ থেকে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এনে প্রাগজ্যোতিষে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত করেন। কিংবদন্তী অনুসারে আর্য নৃপতি নরকই প্রথম প্রাগজ্যোতিষে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

নিধনপুর তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে, যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুরাজা ভূতিবর্মা নানা গোত্রীয় এবং নানা বেদশাখার দুশো ব্রাহ্মণকে অগ্রহার ভূমি দান করেছিলেন বৈদিক ধর্ম ও শাস্ত্র অনুশীলনের জন্য। ব্রাহ্মণেরা যে শুধু প্রাগজ্যোতিষে বসবাস করেন তাই নয় তাঁরা আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ সাধন না করে তাদের মধ্যে আর্য ধর্ম, আর্য আচার অনুষ্ঠান এবং আর্যভাষা প্রচার করেন। এই আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার পন্থা হিসাবে ব্রাহ্মণেরা আদিম অধিবাসীদের নানা জাতির নাম আর্য নামে পরিবর্তিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোচ শব্দটা আগে আসামের আদিম অধিবাসীদের

একটি জাতির নাম ছিল, পরে ব্রাহ্মণেরা তাকে একটি হিন্দু জাতিতে পরিণত করেন এবং কাছারী লালুং, মিকির প্রভৃতি আসামের আদিম অধিবাসীদের অন্যান্য নানা জাতি এই এক হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আধুনিক অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি মগধী অপভ্রংশ থেকে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কামরূপ নৃপতি ভাস্কর বর্মার আমন্ত্রণে হুয়েন সাং আসামে আসেন। তিনি তাঁর বিবরণে বলেছেন যে কামরূপে সেই সময়ে যে ভাষার প্রচলন ছিল, সেটা মধ্য ভারতে প্রচলিত মাগধী থেকে কিছু অন্য রকম। আধুনিক ভাষার উৎপত্তি মাগধী অপভ্রংশ থেকে এবং সংস্কৃত থেকে অপভ্রংশের জন্ম। অপভ্রংশ ভাষাগুলির মধ্যে মাগধী অপভ্রংশের দুটি শাখা প্রাচ্য এবং পশ্চিমা। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচ্য মাগধীকে চারটি ভাষা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম তিনটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে পশ্চিম মধ্য ও পূর্ব বাংলার এবং উড়িষ্যার আধুনিক ভাষা। চতুর্থটি আসাম এবং উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু অংশে প্রচলিত আধুনিক ভাষার জনক। হুয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আসামে আর্যভাষা অনুপ্রবেশ করেছিল।

আধুনিক আসামীভাষার শব্দভাণ্ডার সংস্কৃত শব্দবহুল। এর ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী। তবে এই ভাষা ক্রমবর্ধমান। এই ভাণ্ডারে অন্যান্য আর্যভাষার শব্দসমূহ ফার্সী, আরবী, এবং ইংরাজী শব্দসমূহ গৃহীত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বোড়ো শব্দ, অষ্ট্রীক শব্দ, অহোম শব্দ নানা ভাষা থেকে শব্দ সঞ্চয়নের ফলে, আসামী ভাষা বলিষ্ঠ একটি প্রকাশ মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৌহাটির উত্তরে কানাইবর্ষী নামে একটা জায়গায় একটি পাহাড়ে খোদিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা কামরূপ জয় করার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। মুসলমান ঐতিহাসিক মিনাজের বিবরণ অনুসারে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তাঁর তিব্বত অভিযানের পরেই আসাম আক্রমণ করেন, ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণাবতীর গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজের কামরূপ আক্রমণও নিষ্ফল হয়। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়াস উদ্দিন ইয়ুজবক তুঘরিল খাঁ কামরূপ আক্রমণ করেন ও পরাজিত হন, তাঁর সৈন্যদল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় মুহম্মদ শাহের আসাম আক্রমণও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এবং তাঁর সৈন্যদলও বিনষ্ট হয়।

ক্রমাগত মুসলমানদের বিফল আক্রমণের ফলে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের ভিত্তির অটলতা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না এবং ক্রমে এই রাজ্য খণ্ডিত হয়ে নানা বিক্ষিপ্ত অংশে বিভক্ত হয়।

এই সময়েই শান আক্রমণকারীরা উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আসামে প্রবেশ করে। এই সব কারণে আসামে নানা স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উৎপত্তি হয় এবং রাজনৈতিক বিবাদের সৃষ্টি হয়।

শান জাতীয় অহোম্ দল সুকফের নেতৃত্বে ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের পূর্বাঞ্চল অধিকার করে রাজ্য শাসন করতে থাকে। তাদের রাজধানী ছিল বর্তমান জোড়হাটের কাছে সরাইদেও।

তিব্বত বর্মীয় জাতির কাছারী নামে একটি দল, যারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আসামে প্রবেশ করেছিল, তারা এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরে তাদের রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্য ছিল দিখউ এবং কলং নদীর মধ্যবর্তী। ধনশিরি (ধনশ্রী) নদীর উপত্যকা এবং কাছাড় জেলা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ডিমাপুর। এই ভাবে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য খণ্ডিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ্যের সীমা ছিল পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্যন্ত এবং বর্তমানের রংপুর জেলা কুচবিহার, গোয়াল পাড়া ও কামরূপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপ রাজ্যের সীমারেখা সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নামও পরিবর্তিত হল এবং নূতন নামকরণ হল কমতা। এই নূতন রাজ্যের রাজধানী হল কমতাপুর বর্তমান কুচবিহার থেকে আঠারো মাইল দূরে।

২। অসমীয়া সাহিত্যের সূত্রপাত

কমতা রাজ্যের প্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন দুর্লভনারায়ণ, তাঁর রাজত্বকাল ছিল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী। ইনি কবি এবং পণ্ডিতব্যক্তিদের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং আসামী ভাষায় সাহিত্য রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। এঁর সময় থেকেই আসামী ভাষায় সাহিত্যরচনার সূত্রপাত হয়। দুর্লভনারায়ণের সভাকবিদের অন্যতম হরিহর বিপ্র আসামীভাষায় বভ্রুবাহনের যুদ্ধ নামে কাব্য রচনা করেন। দুর্লভনারায়ণের প্রশস্তি শ্লোকে এই কাব্যের প্রারম্ভ।

এই সময়ে চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি কাছারী নৃপতি মহামাণিক্যের উৎসাহে মাধবকন্দলী সম্পূর্ণ বাল্মীকির রামায়ণ সংস্কৃত থেকে অসমীয়া ভাষায়

অনুবাদ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মাধবকন্দলীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁর হাতেই অসমীয়া ভাষা বলিষ্ঠ ও কবিত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। আসামের সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকবি শঙ্করদেব মাধবকন্দলীর রচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। ষোড়শ শতাব্দীতে আসামে দুটি জাতি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কোচ এবং অহোম্ এই দুই জাতি সমগ্র আসাম অধিকার করে দুইভাগে ভাগ করে নেয়। প্রাচীন কমতাপুর রাজ্যটি ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই রাজ্যের ভগ্নাবশিষ্ট থেকে একটী নূতন রাজ্য জন্মলাভ করে। কোচ জাতির নেতা বিশ্বসিংহ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং কোচবিহার (বর্তমান কুচবিহার) এই নূতন রাজ্যের রাজধানী হয়। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক এবং তাঁরই সমতুল্য পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন।

নরনারায়ণ বারাণসীতে শিক্ষালাভ করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন।

নরনারায়ণ ও তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ ওরফে শিলারায় তাঁদের রাজসভায় ব্রাহ্মণদের এবং বারাণসী ও অন্যান্য জায়গা থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। এঁরা দুজনেই হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং পণ্ডিতব্যক্তি ও কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁরা তাঁদের প্রজাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।

নরনারায়ণ সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু কবি শঙ্করদেব এবং তাঁর শিষ্যদের রাজসভায় আমন্ত্রণ করেন এবং প্রভূত দানে তাঁদের সম্মানিত করেন। নরনারায়ণ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন কিন্তু একজন রাজাকে দীক্ষা দিতে শঙ্কর অস্বীকার করেন। শিলারায় শঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহের ফলে কোচরাজ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করে।

এই সময়ে অহোমরাও পূর্বাঞ্চলে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ী-করণে ব্যস্ত ছিলেন।

আহোমরাজ সুহুংমুং অথবা দিহিঙ্গীয়রাজ ১৪৯৮–১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে তাঁর রাজধানীর চারিদিকে বেষ্টিত ছুটিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ডিমাপুর থেকে কাছারীদের বিতাড়িত করেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরবর্তী সমস্ত

ভূঁইয়াদের দখলে আনে। সুহুংমুং কোচরাজ বিশ্বসিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। অহোম নৃপতিদের মধ্যে সুহুংমুংই সর্বপ্রথম হিন্দুধর্ম, হিন্দুনাম স্বর্গনারায়ণ এবং হিন্দু জীবনযাত্রার রীতি পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

এই নৃপতির রাজত্বকালেই আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং সুহুংমুংএর রাজত্বকালেই বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে আসামের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে এক অভূতপূর্ব নব জাগরণের সূচনা হয় এবং আসামে বৈষ্ণবধর্মের মূল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আসামে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসামে বৈষ্ণব ধর্ম দৃঢ়মূল হয়। ১৪৪৯-১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ভাগবতী আন্দোলনের অধিনায়ক শঙ্করদেব আবির্ভূত হন। এই সময় আহোমরাজ সুহুংমুং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আহোমরাজ জয়দেব সিংহ (১৬৪৮-৬৩) থেকে রুদ্রধ্বজ সিংহ (১৬৯৬-৮১) পর্যন্ত আহোম রাজারা বৈষ্ণব গোস্বামীদের নিকটে নিয়মিত দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের প্রতি গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। অহোম রাজারা বৈষ্ণব গোস্বামীদের অর্থদান, ভূমিদান ইত্যাদি দ্বারা নানা রকমে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বৈষ্ণব মঠ এবং আশ্রমগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আহোম রাজারা সব রকমে সাহায্য করতেন। আহোমরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব আসামের প্রধান সত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আসামে বৈষ্ণবধর্ম সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে যখন আহোম রাজার জয়ধ্বজ সিংহ নিরঞ্জন বাপুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিরঞ্জন বাপু সুবৃহৎ আউনিয়াটি সত্রের প্রথম গোস্বামী এবং সত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বনমালী গোস্বামীর খ্যাতি শুনে রাজা জয়ধ্বজ সিংহ তাঁকে কোচবিহার থেকে আনিয়ে কোলিয়াবর এবং মাজুলীতে সত্র স্থাপনের জন্য ভূমিদান করেন। রাজা চক্রধ্বজ সিংহের (১৬৬৩-১৬৭০) বনমালী গোস্বামীর প্রতি গভীর ভক্তি ছিল।

রাজা উদয়াদিত্য (১৬৭০-৭২) আহতগুরি সত্রের বৈষ্ণব মহান্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন পরে অবশ্য তিনি বৃন্দাবনের এক অজ্ঞাত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী পরমানন্দ বৈরাগীর প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। রাজা রামধ্বজ সিংহ (১৬৭২-১৬৭৪) বৈষ্ণব মোহান্ত নরওয়া ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং

শুজিনকা (১৬৭৪-৭৭) এবং অতনবুঢ়া গোহাই মোয়ামরিয়াসত্রের শিষ্য ছিলেন।

স্বলিথপালোরা রাজা এবং গৌহাটির শাসনকর্তা বরনবর কুকন দক্ষিণপাট সত্রের বনমালীদেবের শিষ্য ছিলেন। রাজা রুদ্র সিংহ বৈষ্ণব মহান্ত এবং তাঁদের শিষ্যদের ধর্মমত সম্বন্ধে খুবই উদারভাবাপন্ন ছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পিতা গদাধর সিংহ যে সব বৈষ্ণবদের নির্যাতন করেছিলেন, তাদের নিজ নিজ সত্রে শান্তিতে বাস করার ব্যবস্থা করে দেন।

রুদ্র সিংহ সমস্ত বৈষ্ণব সত্র এবং মহান্তের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তাদের যথোচিত রাজকীয় স্বীকৃতি পত্র প্রদান করেন।

রুদ্র সিংহের রাজতালিকাভুক্ত বৈষ্ণব মহান্তরা এতকীয়া মহান্ত নামে পরিচিত ছিলেন। এতক ১২৮০ কড়ি মূল্যের টাকা। ১২৩০ জন মহান্ত যাঁরা রাজ-স্বীকৃতির সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরাই একত্রে এতকীয়া মহান্ত বলে পরিচিত ছিলেন।

তুংগুঙ্গিয়া বুড়নজীত লিপিবদ্ধ অনুসারে অহোম রাজাদের অভিষেকের সময় তাঁদের আশীর্বাদ করবার বিশেষ অধিকার ছিল প্রধান প্রধান সত্রাধিকা বৈষ্ণব মহান্তদের। এই রীতি পালিত হয়েছিল রাজা প্রমথ সিংহ রাজেশ্বর সিংহ এবং গৌরনাথ সিংহের অভিষেকের সময়।

শঙ্করদেব (জীবনী)

১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের জন্ম হয় ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরবর্তী আলিপুখুরী গ্রামে। এই গ্রাম বর্তমান নওগাঁ শহর থেকে ষোলো মাইল দূরে। যে বংশে শঙ্কর জন্মেছিলেন, তার নাম ছিল শিরোমণি ভূঁইয়াবংশ, অর্থাৎ ভূঁইয়াদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ভূঁইয়ারা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী জায়গীরদার, রাজানুগ্রহে তাঁরা সমস্ত সামাজিক সুখ সুবিধা ভোগ করতেন।

শঙ্করদেবের বাবার নাম ছিল কুসুম বর। জন্মের তিনদিনের মধ্যে শঙ্কর মাকে হারান এবং তাঁর ঠাকুমা খেরসুতী তাঁকে লালন পালন করেন। বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে মাধবকন্দলীর পাঠশালায় পাঠানো হয়, বাইশ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিতের খ্যাতি অর্জন করেন। এর কিছুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে সূর্যবতীর পরিণয় হয়। চার বছর পরে একটি শিশুকন্যাকে রেখে সূর্যবতী ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সময়ের কাছাকাছি শঙ্করের পিতৃবিয়োগ ঘটে। দুইটি পর পর শোকঘটনায় শঙ্কর অভিভূত হয়ে পড়েন, তাঁর তরুণ হৃদয়ে বেদনাঘাত এত তীব্র হয়, যে তিনি সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। কন্যার বিবাহ দেওয়ার কর্তব্য সম্পন্ন করে ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর অতিশয় কষ্টসাধ্য সুদূর তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন, সতেরো জন তাঁর সঙ্গী হন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর গুরু মাধবকন্দলী। শঙ্করদেব গয়া, পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কাশী, প্রয়াগ, সীতাকুণ্ড, বরাহকুণ্ড, অযোধ্যা, বদরীকাশ্রম প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণ করেন এবং নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের সঙ্গে শঙ্করের গভীর শাস্ত্রালোচনা হয়। এই সব আলোচনায় বৈষ্ণবধর্ম শঙ্করদেবের মনে সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করে। শঙ্করদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন, তার মধ্যে তাঁর তীর্থযাত্রাকালীন বৈষ্ণব শাস্ত্রালোচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বারো বৎসর শঙ্কর তীর্থে ভ্রমণ করে বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্র, বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব বৈষ্ণবসাহিত্য ও বৈষ্ণব পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

শঙ্করদেবের আবির্ভাবের যুগে আসামে শাক্ত এবং তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষেরা সকলেই শাক্ত ছিলেন, এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল দেবীদাস অর্থাৎ পরম দেবী ভক্ত শাক্ত সাধক

শঙ্করদেবের ভক্তশিষ্য মাধবদেব এবং সে যুগের আর একজন প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ভট্টদেব ধর্মান্তর গ্রহণের আগে শাক্ত ছিলেন। গৌহাটির কামাখ্যা মন্দির, সদিয়ার তাম্রেশ্বরী মন্দির, দুরীর পরিহরেশ্বর মন্দির এবং দেরগাঁও-এর মহাদেবের মন্দির শক্তিপূজার সর্বপ্রধান পীঠস্থান ছিল।

ধার্মিক, অধার্মিক মঠাধ্যক্ষ, পুরোহিত কিম্বা বিষয়ী ও সংসারী নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের জীবনে এই সব পীঠস্থানের প্রভুত্ব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

কালের গতিতে শাক্ত পূজা পদ্ধতির মধ্যে আদিম অধিবাসীদের নানা ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান মিশে যায়, যার ফলে তা তন্ত্রতার উৎপত্তি হয়।

শঙ্করদেবের জন্মের পূর্বে আসামে প্রচলিত তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে কতগুলি বীভৎস আচার অনুষ্ঠান পালিত হত। নরবলি তাদের মধ্যে অন্যতম।

শঙ্করদেবের ধর্ম আন্দোলনে সত্রের ভূমিকা

শঙ্করদেবের ধর্ম আন্দোলনে কতগুলি প্রতিষ্ঠান বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, এদের মধ্যে সত্র ও নামঘর উল্লেখযোগ্য।

সত্রগুলি মধ্যযুগের মঠের মত। এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নির্জন শান্ত এলাকায়—সাংসারিক কোলাহল, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ যেখানে পৌছায় না।

প্রথম সত্র স্থাপন করেছিলেন শঙ্করদেব নিজেই, তাঁর পৈতৃক বাসস্থান বড়দোবা গ্রামে। পরবর্তীকালে বড়দোবা গ্রাম থেকে বড়পেটা পর্যন্ত পর্যটনের সময়ে শঙ্করদেব যেখানে যেখানে বাস করেছিলেন, সেইখানেই একটি করে সত্র স্থাপিত হয়েছিল।

শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদলের মধ্যে বিশেষ করে তাঁর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শিষ্যদের মত বিরোধের ফলে সত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবের মৃত্যুর পর শঙ্কর সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তীব্র মতপার্থক্যের ফলে বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সব সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য মূল সত্রগুলির অধীনে কতগুলি শাখা সত্র স্থাপিত হয়।

মূল এবং শাখা উভয় প্রকার সত্রের গৃহের গঠনাকৃতি এবং কাজ কর্মের ব্যবস্থা একই রকম।

প্রত্যেকটি সত্রের প্রধান গৃহটি করপট, নামঘর, মণিকূট, হাতি এবং

সত্রাধিকার বা মহান্তের বাসগৃহ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি সত্রেরই চারটিকরণট প্রবেশদ্বার, মধ্যস্থলে নামঘর বা কীর্তনঘর, এইটিই প্রধান উপাসনালয়, নামঘরের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষ মণিকুট।

মণিকুটের মধ্যস্থলে থাপনা বা বেদী, বেদীর উপরে একটি সিংহাসন, সিংহাসনটি কাঠের তৈরী, চারটি খোদিত সিংহমূর্তির উপর বসানো। সিংহাসনের উপরে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত।

কাল অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে শঙ্করদেবের নিষেধাজ্ঞার তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে, ফলে কতকগুলি সত্রে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সত্রগুলিতে কৃষ্ণমূর্তি স্থাপিত হয়।

থাপনার চারিদিকে মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং ধূপ পোড়ানো হয়। হাতিগুলি কতগুলি কুটিরের সমষ্টি, সত্রগুলির বিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিকে নির্মিত। এই কুটিরগুলির এক একটি কক্ষে এক এক জন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বাস করেন।

১৯০৫ সালের "The District Gazetter of Sibsagar" এ সত্র সম্বন্ধে লেখা আছে—

"There is something singularly gracious and pleasing in the whole atmosphere of the place. Everything is fresh and neat and well-to-do. The well-groomed smiling monks are evidently at peace with themselves, and with the world at large, and even the little boys who flock around them are usually clean and well-behaved. These children are recruited from the neighbouring Villages and trained upto be Bhaktas, but if at any time they find the rituals of celebacy irk some they are at liberty to return to the outer world."

শঙ্কর সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যদের শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার জন্য যাজক সম্প্রদায়ের মহান্ত, ভক্ত, শিষ্য প্রভৃতি এবং গ্রামের সাধারণ নরনারী সত্রের নানা বিভাগীয় কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন।

কেওলিয়া নামধারী একদল শিষ্য সত্রে বাস করেন এঁরা অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করে সত্রবাসী হন এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে ধর্মাচারণ ও ধার্মিক জীবন অতিবাহিত করেন। সত্র পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব সত্রাধিকারের।

কোনো কোনো সত্রে সত্রাধিকার মহান্ত অথবা গোঁসাই নামে আখ্যাত হন। সত্রাধিকারেরা সাধারণত সন্ন্যাসজীবনই যাপন করেন তবে কোনো কোনো সত্রের সত্রাধিকার বিবাহিত ও গৃহীও হয়ে থাকেন।

জাতিতে কোনোব্যক্তি শূদ্র হলেও শঙ্কর সম্প্রদায়ের সত্রাধিকার নিযুক্ত হতে পারেন, তখন সমাজে তিনি ব্রাহ্মণের সমপর্যায়ভুক্ত হন।

সত্রাধিকার বাদে সত্রের অন্যান্য কর্মচারীরা হলেন—

১। ভাগবতী—ইনি ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২। পাঠক—ইনি ধর্মশাস্ত্রসমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৩। দেউরী—ইনি সমবেত উপাসনার পর মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

৪। ভাড়ালি—যাঁর উপরে ভাঁড়ারের ভার দেওয়া থাকে।

৫। শ্রবণী—যাঁদের প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করতে হয়।

৬। অঠপরিয়া—যাঁরা সত্র পাহারা দেন এবং নামঘরে বাতি জ্বালান।

৭। হাতিমত—যাঁরা হাতিনিবাসী সন্ন্যাসীদের উপাসনা সভায় আহ্বান করেন।

৮। গায়েন, বায়েন—যাঁদের উপর সমবেত উপাসনা সভা, কীর্তন, ভাওনা ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় গীতবাদ্যের ভার দেওয়া থাকে।

সত্রাধিকারের পরিচালনায় পূজাপাঠ, প্রার্থনা, কীর্তন ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তবৃন্দ মিলিত হন। এই সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠানের নাম—প্রসঙ্গ। সমস্ত দিনে চৌদ্দটি প্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়—পাঁচটি সকালে, তিনটি মধ্যাহ্নে এবং ছয়টি সন্ধ্যায়।

শঙ্কর সম্প্রদায়ের ধর্ম উৎসবে প্রসঙ্গ, নামকীর্তন

শ্রীভগবানের স্তবগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন গ্রামের আপামর জনসাধারণ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। সমবেতভাবে পূজা, প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়, কীর্তন গাওয়া হয়, শাস্ত্রপাঠ হয়, সাধু মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করা হয়, খোল করতাল বাজানো হয়, চারিদিকে মাটীর প্রদীপ জ্বালানো হয়, ধূপ পোড়ানো হয় এবং উৎসবের শেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে একটি সত্রের উৎসব অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র শঙ্কর-

দেব, মাধবদেব এবং সেই বিশিষ্ট সত্রের সন্ন্যাসীদের রচিত গীতই গাওয়া হয়, অন্য সাধারণ কোনো ব্যক্তির রচিত গান গাওয়া নিয়মবিরুদ্ধ।

সত্রগুলি একাধারে ধর্মশিক্ষাকেন্দ্র এবং ছাত্রাবাস যুক্ত বিদ্যালয়। ভক্ত শিষ্যবৃন্দ সত্রে বাস করেন সত্রাধিকারের কর্তৃত্বাধীনে। তাদের ঐহিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দায়িত্ব সত্রাধিকারই গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থী ভক্ত যখন সত্রে প্রবেশ করেন, তখন তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে। শিষ্য সন্ন্যাসীকে বলা হয় অলধর অর্থাৎ গুরু সন্ন্যাসীর ব্যক্তিগত সেবক অনুচর। গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মচর্যপালন, নিয়মানুবর্তিতা, উপাসনা পদ্ধতি এবং ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা দেন।

গুরু ছাড়াও শিষ্য সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দেন সত্রের অন্যান্য কর্মীরা—ভাগবতী ও পাঠক। এঁরা শিক্ষা দেন মৌখিক উপদেশ, লিখিত পরীক্ষা ও উপাসনার মাধ্যমে।

সত্রের সন্ন্যাসীদের অসমীয়া ভাষায় সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ এবং সংস্কৃত বা অসমীয়া ভাষার মৌলিক গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সত্রের সন্ন্যাসীরা পুঁথি নকল, পুঁথির মধ্যে চিত্রাঙ্কন, মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহের কাজ প্রচলিত প্রথা হিসাবে গ্রহণ করেন এই কাজে শিক্ষার্থী ভক্তরাও সাহায্য করেন।

সত্রগুলিতে তর্কসভার আয়োজন করা হয় এবং দেশ বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সব সভায় যে তর্ক আলোচনা হয়, তার মাধ্যমে শিষ্য সন্ন্যাসীরা তাঁদের পাঠ্য শাস্ত্রবিষয়ক অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া নানা সাংসারিক বিষয়েও শিষ্যেরা শিক্ষালাভ করেন। ভক্ত শিষ্যদের বেশীর ভাগই আসেন গ্রামাঞ্চল থেকে, তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন গ্রামীণ কুটীরশিল্পের কারিগরী বিদ্যা। এই শিল্প-বিদ্যা চর্চার জন্য শিষ্যেরা সত্রগৃহ এবং নিজেদের আবাস কুটীর নির্মাণ করেন এবং কারুকার্যে মণ্ডিত করেন। এ ছাড়া তাঁরা কাঠ, বাঁশ, বেত, হাতীর দাঁত প্রভৃতিতে নানা প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যবহার্য প্রস্তুত করেন।

শিষ্য সন্ন্যাসীদের গীত ও বাদ্যযন্ত্রে শিক্ষা দেন গায়েন ও বায়েন। শঙ্করদেব নিজে সুগায়ক ও বাদ্যযন্ত্রকুশলী ছিলেন, তিনিই খোল বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

শিষ্যসন্ন্যাসীদের শিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ নৃত্য শিক্ষা। ধর্মীয় উৎসব

অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে শিষ্যসন্ন্যাসীদের সূত্রধরী, চলি, নাটুয়া কৃষ্ণ গোপী প্রভৃতি নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানেও আসামের বৈষ্ণব সত্রগুলিতে নৃত্য শিক্ষার প্রচলন আছে। সত্রবাসী ভক্ত শিষ্যেরা শিক্ষা সমাপনান্তে ইচ্ছামত সন্ন্যাস জীবন বা গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করতে পারেন। শঙ্করদেবের ধর্মমতের সঙ্গে বিবাহিত বা গৃহী জীবনের কোন বিরোধ নাই।

সুবিশাল সত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সুদূর অতীতে আহোম রাজারা এবং উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা এই ব্যয়ভার বহন করতেন। আহোম রাজারা সত্র প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বহু বিস্তীর্ণ এলাকার করমুক্ত ভূমিদান করেছিলেন. ইংরেজ রাজসরকার এই ভূমিদানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সত্রগুলির অন্য আয়ও আছে। সত্রের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভক্তকে গুরুকর দিতে হয়। এই গুরুকর অর্থে বা বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রীতেও দেওয়া চলে। গ্রামবাসীদের প্রত্যেক জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ উপলক্ষে সত্রে কিছু কর দিতে হয়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য সত্রে নিযুক্ত কয়েকজন কর্মচারী থাকে—মেধি, রাজমেধি সজতোলা এবং পচনি। গ্রামবাসীদের প্রদত্ত অর্থেই সত্রগুলি বিত্তশালী এবং অতিশয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত।

নামঘর

আসামের সত্র প্রতিষ্ঠান গ্রামবাসী জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে বিশেষ উদ্যোগী। ভক্তি আন্দোলনের গোড়া থেকেই জনসাধারণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সত্রগুলি গ্রামে গ্রামে নামঘর প্রতিষ্ঠা করেছিল। গ্রামের নামঘরগুলি প্রত্যেক গ্রামের সর্বপ্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান—যেন গ্রামের স্নায়ুকেন্দ্র। নামঘরের কার্যকলাপের মাধ্যমেই গ্রামের জন জীবনে শিক্ষা সংস্কৃত প্রসার ঘটানো, এবং জীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—সকলদিকের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়।

নামঘরে সুর করে ভাগবত ও গীতা আবৃত্তি করা হয়, নানা রাগরাগিণীতে বড়গীত গাওয়া হয়, নামকীর্তন ও শ্রীভগবানের স্তবগান করা হয়, ভাবনা বা নাট্য অনুষ্ঠান এবং নানা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জীবনের নানা সমস্যা, ধর্ম, দর্শন ও শাস্ত্র বিষয়ে তর্কসভা বসে।

নামঘরগুলি পঞ্চায়েত সভাগৃহের কাজও করে। নামঘরে মিলিত হয়ে

জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। নামঘরেই গ্রামবাসীদের অপরাধের বিচার এবং বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করা হয়।

নামঘরগুলি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। এইগুলির পরিচালনার ভার জনসাধারণের উপরেই ন্যস্ত। নামঘরের পরিচালনা বিষয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীর মত প্রকাশের অধিকার আছে। গ্রামবাসীদের সম্মিলিত পরিশ্রমে এবং আর্থিক সাহায্যে নামঘরগুলি নির্মিত হয়, মেরামত হয়, এদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হয়, এই ভাবে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত ও ও যত্নে নামঘর গুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নামঘরের কাজে মেয়েরা নিযুক্ত হন, প্রত্যেক পরিবারের মেয়েরা পালা করে নামঘরগুলি ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেন, মেয়েরাও দীক্ষা নেন, এবং নামঘরে নামকীর্তন করেন, অবশ্য ভিন্নভাবে, পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নয়।

যদিও অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও মেয়েদের দীক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁরা সম্প্রদায়ভুক্ত হন কিন্তু একমাত্র শঙ্কর সম্প্রদায়েই মেয়েরা সত্রাধিকারের সম্মানিত পদের অধিকারী হতে পারেন।

শঙ্করদেবের পৌত্রবধূ শুধু যে সত্রাধিকারই ছিলেন তা নয়, তিনি নূতন সত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারোজন সত্রাধিকার নিযুক্ত করেছিলেন।

শঙ্করদেবের ভক্তি আন্দোলনে সত্রগুলি যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা হচ্ছে আসামের প্রান্তসীমাবাসী উপজাতি এবং নিম্নশ্রেণীর পতিত ও দুর্গত মানুষদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাদের জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো জেলে দিয়ে তাদের মানসিক উন্নতি বিধান করে তাদের জীবনে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করেছিল।

শঙ্করদেবের ধর্মপ্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজে জাতি বিদ্বেষ এবং অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ সাধন। শঙ্করদেব প্রচার করেছিলেন ভগবানের কাছে মানুষ সব এক। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ অকৃত্রিম ভক্তিতে চণ্ডালও তার জাতি দৈন্য অতিক্রম করতে পারে। ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে প্রকৃত ভক্তিমান চণ্ডাল শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যত নিম্নশ্রেণীর মানুষই হোক না কেন, ভক্তিভরে একবার যদি শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারে তবেই সে বন্ধন থেকে রেহাই পায়।

পতিত, দুর্গত ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্ত শঙ্করদেবের অশেষ করুণা ও সহানুভূতি ছিল। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও প্রধান শিষ্যেরা ছিলেন—চন্দসাঁই ও জয়হরি দুই মুসলমান, জয়হরি ভুটিয়া, শ্রীরাম কৈবর্ত, মাধব কুমোর।

উপসংহারে বলা যায় সত্র প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের সাহায্যেই শঙ্করদেবের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন সক্ষম হয়েছিল।

শঙ্করদেবের ধর্মমত ও রচনাবলী

শঙ্করদেবের ধর্মমত ভাগবতপুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, এর প্রধান অবলম্বন শ্রীধর স্বামীকৃত ভাগবতের টীকা—ভাগবতভাবার্থ দীপিকা। শঙ্করদেব তাঁর রচিত ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে ভাগবতভাবার্থ দীপিকা এবং শ্রীমদ্ভাগবতগীতা থেকে প্রচুর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

শ্রীধর স্বামীর উক্তি অনুসারে তিনি স্ব সম্প্রদায় অর্থাৎ তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের অনুরোধে ভাগবতভাবার্থ দীপিকা রচনা করেছিলেন। অনেকের অনুমান বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ই শ্রীধর স্বামীর স্ব সম্প্রদায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন এবং এর মধ্যে যে দ্বৈতবাদ প্রচারিত হয়েছিল, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে তাই পূর্ণবিকাশ লাভ করে।

ঐতিহাসিক ধারা অনুসারে উত্তর ভারতে রামানন্দ যে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং দক্ষিণ ভারতে রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায় যার পুষ্টিবিধান করেন, শঙ্করদেবের ভক্তি আন্দোলনে তার পূর্ণ পরিণতি সাধিত হয়।

শঙ্করদেবের মতে বিশ্ব জগতের কেন্দ্রস্থিত পরমাত্মাই নিত্য সত্য। জীবাত্মা, প্রকৃতি বা জড়বস্তু কিছুই পরমাত্মা ব্যতীত অস্তিত্বলাভে সমর্থ হয় না।

জীবজগতের অণুপরমাণু পর্যন্ত সব কিছুই পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত।

তুমি পরমাত্মা জগতের ঈশ এক
এক বস্তু নাহিকে তোমাত ব্যতিরেক।

দার্শনিক হিসাবে কিন্তু শঙ্করদেব অদ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদী দার্শনিকদের মত তিনি পরমাত্মার দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর সম্প্রদায়ে অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহের স্থান নেই।

রামানন্দের সীতারাম, বল্লভাচার্যের গোপীকৃষ্ণ, নামদেবের রুক্মিনী কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাকৃষ্ণ, কিন্তু শঙ্করদেবের কেবলমাত্র মাধব।

শঙ্করদেব তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন—

প্রকৃতি পুরুষ দুইরো নিয়ন্তা মাধব।
সমস্তরে আত্মা হরি পরম বান্ধব।

নামঘোষা ঈশ্বরনির্ণয় ৪০৫

॥ ২ ॥

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করদেবের অদ্বৈতবাদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় যাতে তাঁকে পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী বলে স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করদেবের মতে যদিও পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার উৎপত্তি তবু তাঁরা অভিন্ন নন, এবং অস্তিত্ব হিসাবে উভয়েই স্বাধীন, তবে অস্তিত্বে পৃথক হলেও পরমাত্মা ও জীবাত্মা অবিচ্ছেদ্য, এবং মায়ার বশে জীব ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

শঙ্করদেবের মতে মায়ার কবল থেকে নিস্তারের এবং মোহমুক্তির একমাত্র উপায় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ধ্যান এবং নামজপ।

শঙ্করদেবের ধর্মমত এক শরণীয় নামধর্ম নামে খ্যাত তার কারণ তিনি একমাত্র বাসুদেব কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, অন্য কোনো দেবদেবীর উপাসনা তাঁর ধর্মমতে স্থান পায় নাই। শঙ্করদেবের মতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম এবং এই জন্যই তাঁর ধর্মে অন্য দেবদেবীর উপাসনা নিষিদ্ধ ছিল। শঙ্করদেব তাঁর রচিত ভক্তিপ্রদীপ গ্রন্থে তাঁর অভিমত স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে—

এক চিত্তে তুমি মোকো মাত্র কর সেবা।
পরিহরা দূরতে যতেক আন দেবা॥
হুয়োকো শরণাপন্ন এক মোতে মাত্র।
মোকে ভজা হইবা তবে মুকুতির পাত্র॥
নাম নু শুনিবা তুমি আন দেবতার।
যেন মতে হুহিবে ভকতি ব্যভিচার॥

শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম শঙ্করদেবের এই পরিকল্পনার উৎস ভারতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬নং শ্লোক—

সত্যব্রতং সত্য পরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে

সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্ন।

এই শ্লোক দেবকীর গর্ভে ভগবান নারায়ণের আবির্ভাবের আনন্দে দেবগণ সহ ব্রহ্মার স্তুতি—আপনার সঙ্কল্প সত্য, সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়, ত্রিকালে আপনিই সত্য, আপনি পঞ্চভূতের কারণ পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ও পঞ্চভূতের লয়ে কারণরূপে আপনিই থাকেন, আপনি সত্যবাক্য ও সমদর্শনের প্রবর্তক। অতএব সত্যস্বরূপ—আপনার আমরা শরণাপন্ন হইলাম।

শঙ্করদেবের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর স্বরূপ প্রকাশ মোক্ষ প্রাপ্ত ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত বৈকুণ্ঠে। সাংসারিক মায়া জীবের বন্ধনস্বরূপ —মোক্ষ লাভের অন্তরায়। এই বন্ধনমুক্তির একমাত্র উপায় ভগবদপোলব্ধি। এই উপলব্ধির উপায় শঙ্করদেবের মতে ভক্তি এবং এই ভক্তিই মুক্তি।

ভক্তি ভিন্ন মোক্ষলাভের আর কোনো পথ নেই। শঙ্করদেবের মতে ভগবদপোলব্ধির সাধনপথ ভক্তিমার্গ। এই সাধনায় ভক্ত ভগবানকে জগতের সব কিছুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন এবং ভগবান ভক্তের নিকটে প্রেমের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

বিশুদ্ধসত্যরূপে ভগবদপোলব্ধির চেয়ে প্রেমের পথে ভগবদপোলব্ধি সহজ, সর্বোপরি এই উপলব্ধিতে জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য কিছুরই বাধা থাকে না। শঙ্করদেব ভক্তিলাভের বাস্তব উপায় নামধর্ম নির্ধারিত করেছিলেন। নামধর্ম অর্থ ভগবানের নাম উচ্চারণ। শুদ্ধচিত্তে একব্রতী মনে একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের নামজপই নামধর্ম। যে কোনো লোক জাতিবর্ণ নির্বিশেষে জীবনের যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো বয়সে, যে কোনো সময়ে, যে কোনো স্থানে শ্রীভগবানের নাম জপ করতে পারেন। ভক্তি রত্নাকরে শঙ্করদেব নামজপের মাহিমা কীর্তন করেছেন—

আপনার নামর সঙ্গ ন চরতে হরি

সেই নাম সেই হরি জানা নিষ্ঠা করি॥

ভক্তি ধর্ম বা প্রেমভক্তির পাঁচটা স্তর,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের মধ্যে শঙ্করদেব দাস্যভাবের উপাসক ছিলেন। শঙ্করদেবের সমস্ত রচনার মূল সুর —হে সমগ্র বিশ্বভুবনের নিয়ন্তা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাস।

শঙ্করদেবের ধর্মসম্প্রদায়ের সকল লেখক তাঁদের গ্রন্থ রচনার শেষে আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলে উল্লেখ করেছেন।

শঙ্করদেবের রচিত নামঘোষার কাকুতি শীর্ষক—পদগুলির মধ্যে তাঁর দাস্যভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তোমার সেবক ভৈলো নারায়ণ এ
নিশ্চয় তোমার দিবাক লাগে প্রসাদ।
নিজ ভৃত্য—করি লৈয়ো গোপীনাথ এ
তযু কৃপাময় মিলয় কোন প্রসাদ॥ ৮০০
হে দয়াশীল দামোদর এ
তোমার চরণে বোলোহো কাকুতিবাণী
মোক নিজ দাস করি লৈলে হরি এ
কহিয়ো কৃপাল তোমার কি হয় হানি॥ ৮০১
তোমারে সে নিজ ভৃত্য ভৈলো হরি এ
কৃপার সাগর তুমি মোর নিজ স্বামী।
মই অনাথক ন বঞ্চিবা হরি এ
তযু সেবা রস আশা করিয়াছি আনি॥ ৮০৪
ভক্তর বজ্ঞ হইবার শঙ্কায় এ
যোনো মোকো তুমি দাস পরিহরা হরি—
হটো শঙ্কা হরি দূরতে তেজিয়া এ
লৈয়োকো তোমার ভৃত্যরি—অধীন করি॥ ৮০৬

শঙ্করদেবের ধর্মমতের অপর নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ এই ধর্ম অবলম্বন করে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পরব্রহ্মের উপলব্ধি ও তাঁর আশ্রয়লাভের সুযোগ পেতে পারতেন। শঙ্করদেবের ধর্মমতের এই বৈশিষ্ট্যর জন্ত আসামে এই ধর্ম ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল—এবং শঙ্করদেবের প্রভাব আসামের জনজীবনে অতি নিবিড়ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। শঙ্করদেবের ধর্মের প্রভাব এত গভীর হয়েছিল, যে বর্তমানেও সে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আজকের দিনেও আসামের এমন গৃহ নেই, যেখানে শঙ্করদেবের কীর্তন ঘোষা পাওয়া যায় না।

শঙ্করদেবের রচনাবলী

শঙ্করদেব ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। কোনো একটি দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করে সেইটি প্রচার করবার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করেন নি।

শঙ্করদেবের রচিত সাহিত্যের মধ্যে তাঁর ধর্মমতের স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে এবং সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই শঙ্করদেবের ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব আমাদের জন জীবনে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে বহুদূর প্রসারী হয়েছিল এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এনেছিল নবজাগরণের জোয়ার।

শঙ্করদেবের রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা সত্ত্বেও এবং সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়েও তিনি সংস্কৃতে পুস্তক রচনা করেন নি, আমাদের চলতি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার আমাদের অশিক্ষিত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

শঙ্করদেবের সাহিত্য রচনায় সর্বাপেক্ষা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল শ্রীমদ্‌ভাগবত। শঙ্করদেবের সমস্ত পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবতকে সূর্যসদৃশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায় —

পুরাণ সূর্য মহাভাগবত বেদান্তরো ইটো পরমতত্ত্ব
আক গুবুলি ফুরে নিন্দা করি, তার মুখ চাই বুলিবা হরি

নামঘোষা, পাষণ্ডমর্দন ১০৫

অর্থাৎ ভাগবতপুরাণ সূর্য, কেননা বেদান্ত দর্শনের সর্বসার ভাগবতের মধ্যেই নিহিত, এর গূঢ়ার্থ না বুঝে যে নিন্দা করে, তার মুখের দিকে চেয়ে হরি নাম করিবে। শঙ্করদেবই সর্বপ্রথম আমাদের চলিত ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা একাধারে দুঃসাহসিক ও অসাধারণ, কেননা সংস্কৃত ভাষার গুরুগম্ভীর চমৎকারিত্ব লঘু প্রাদেশিক চলিত ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের কোচরাজ নরনারায়ণের নিকটে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কর্তৃক শঙ্করদেব ভাগবত পাঠ ও অনুবাদের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

সম্পূর্ণ ভাগবত একজনের পক্ষে অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। শঙ্করদেব নিজে ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম খণ্ড অনুবাদ করেছিলেন এবং অন্যান্য স্কন্ধগুলি অনুবাদের ভার ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যদের উপর

ন্যস্ত করেছিলেন। শঙ্করদেবের ভাগবত অনুবাদের মধ্যে দশম স্কন্ধ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল, কারণ ভগবদ্ভক্তির অনুপ্রেরণা ছাড়াও ভাগবতের দশম স্কন্ধে মানবজীবনের বাস্তবচিত্র শৈশবের বালসুলভ মাধুর্য, শিশু সন্তানের জন্য মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ নির্ঝর, সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ, বেদনাত মাতৃপ্রাণের উদ্বেল উৎকণ্ঠা প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্যে মানুষের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সব কিছুই এই অধ্যায়ে মনোমুগ্ধকর কবিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করদেবের রচিত বৈষ্ণবসাহিত্যে অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণবসাহিত্যের বিপরীত, কোথাও রাধানামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শঙ্করদেবের ভাগবত অনুবাদের পরেই তাঁর কীর্তনঘোষা উল্লেখযোগ্য। অদ্যাবধি আসামের অধিবাসীদের মনে ও চিন্তায় কীর্তনঘোষার প্রভাব অপরিসীম। কীর্তনঘোষা' ছাব্বিশটি কবিতার সমষ্টিতে সম্পূর্ণ একটা কাব্য। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ভাগবতের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে নেওয়া, তবে প্রতিটি কীর্তনের সঙ্গে একটি করে ঘোষা অর্থাৎ ধুয়া বা ধ্রুব পদ—দেওয়া আছে যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শঙ্করদেব রচিত কীর্তনগুলি ধর্মীয় সভা বা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে সমবেতকণ্ঠে আবৃত্তি ও গান করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

শঙ্করদেবের কীর্তনঘোষার রাসবর্ণনার সঙ্গে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাসের শারদীয় রাসবর্ণনার গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কীর্তনঘোষা শঙ্করদেব

একাদশ খণ্ড প্রথমভাগ

প্রথম কীর্তন রাসক্রীড়া

ঘোষা—বলহরি রাম মুকুন্দ মুরারী
বিনাহরি নাম তরিতে না পারি॥
শরত কালর রাত্রি অতি বিতোপন।
রাস ক্রীড়া করিতে কৃষ্ণর ভৈল মন॥
ভৈলন্ত উদিত চন্দ্রপূর্ব দিশ হন্তে।
কামাতুরা স্ত্রীর যেন সন্তাপ মার্জন্তে।
অখণ্ড মণ্ডল চন্দ্র দেখিলন্ত হরি।
কুঙ্কুমে অরুণ লক্ষ্মী মুখ পদ্ম সরি॥

বনকো দেখিলা চন্দ্র রশ্মিয়ে রঞ্জিত।
সুস্বর মধুর করি হরি গাইলা গীত॥
শুনি কামে উত্রাবল হুয়া গোপী গণে।
দিলেক লবড় গীতধ্বনি নিরীক্ষণে॥
কর্ণত কুণ্ডল দোলে বেগত হান্ঠিতে।
চিত্তত ধরিলা কৃষ্ণে চলে অলক্ষিতে॥
কত গোপী যায় গাই দোহনক এড়ি।
আথাতে থাকিল দুগ্ধ চাক সৈতে পড়ি॥
পিয়ন্তে আছিল শিশু তাহাকো নগণি।
পতি শুশ্রুষাকো এড়ি যায় কতো প্রানী॥
কতো গোপী আছিল স্বামীর পরিশন্তে।
আধা ভূঞ্জা হুয়া কতো যায় লবুড়ন্তে॥
কৃষ্ণের শ্রবণে যেন হরিদাসগণে।
এড়ে কাম্য কর্ম সবে তদ্গত মনে॥
কৃষ্ণে হরিলন্ত চিত্ত হারাইল চেতন।
পিন্ধয় পারত নিয়া বস্ত্র কঙ্কণ॥
হাতত নূপুর আড়ে কঙ্কালত হার।
করি বিপর্যয় পিন্ধে বস্ত্র অলঙ্কার॥
তথাপি কৃষ্ণক পাইলা গোপিকা সকল।
ভকতর কর্ম যেন নভৈল বিফল॥

দ্বিতীয় কীর্তন—

ঘোষা ভবহারী হরি তার হু মুকুন্দ মুরারি।
জনম মরণ ক্লেশ সহিতে না পারি॥
যেবে যেবে সমীপ পাইলেক গোপনারী।
তা সম্বাক বাক্য মোহি বুলিলা মুরারী॥
কুশলে কি আইলা কৈয়ো ব্রজের কল্যাণ।
প্রিয় কর্ম করো কিবা কহিয়ো নিদান॥
দুর্ঘোর রজনী প্রেত পিশাচর গতি।
ঐ ত ন থাকিবা তোরা সব স্ত্রী মতি॥

তোমা সাক না দেখিয়া পিতৃমাতৃচয় ।
তা সবার মনে মহা মিলিব সংশয় ॥
দেখিলাহা ইটো বিকশিত বৃন্দাবন ।
পশাকে ধবল নব পল্লবে শোভন ॥
উলটি ব্রজক যাহা কান্দে শিশুগণ ।
তা সবাক প্রতিপালি পিয়ায়োক স্তন ॥
উপপতি সমে ক্রীড়া গরিহিত কর্ম ।
স্বামী শুশ্রূষা কুলস্ত্রীর মহাধর্ম ॥
যদি বা আমাক স্নেহে আইলা গোপীগণ ।
মোক আবে দেখিলা সিজিল প্রয়োজন ॥
বিদূরত থাকি করে শ্রবণ কীর্তন ।
যাতে মোত ভকতি নির্মল হোবে মন ॥
দেখন্তে শুনন্তে সদা হেলা হোবে মতি ।
জানিয়া গৃহতে থাকি করিয়ো ভকতি ॥
কৃষ্ণের বিপ্রিয় বাণী শুনি গোপীগণ ।
পাইলন্ত দুরন্ত চিন্তা বিবর্ণ বদন ॥
ওলমাইল মুখ অতি পায়া দুঃখ ভার ।
সহনে নিশ্বাস কাঢ়ে শুখাইল অধর ॥
কুচর কুঙ্কুম মানে লোতকে লেপিল ।
থাকিল নিচুকি মুখে বচন হরিল ॥
চরণে ভূমিক লেখে দেখে তমোময় ।
বোলা হরি হরি হোক পাপর প্রলয় ॥

তৃতীয় কীর্তন ঘোষা—

গোপাল কৃষ্ণ করহু ত্রাণ ।
তোমাক না দেখি ন সহে প্রাণ ॥
শোকুক তত্তায়া গোপীসকলে ।
জলচিলা মুখ আখি আকুলে ॥
গদগদ মাত মুখে নোহাই ।
বুলিবে লাগিলা কৃষ্ণকে চাই ॥

ভকত বৎসল তোমাকে জানি।
কেনে বোলা হেন বাতুক বাণী ॥
সমস্ত বিষয় এড়িয়া স্বামী।
ভজিলে তোমার চরণে আমি ॥
ভজিয়ো আমাক ত্রিলোক ত্রাণ।
নকরা নাথ ভকতক ত্যাগ ॥
কহিলা যিটো কুলস্ত্রীর কর্ম।
তোমাতে থাকোক সিসব ধর্ম ॥
জগতরে বন্ধু আত্মা তুমি।
সমস্ত ধর্মর আপনি তুমি ॥
তুমি আত্মা হেন জানি সম্প্রতি।
তোমাতসে করে ভকত রতি ॥
নলাগে পতিপুত্রে দুঃখ হেতু।
হয়োক প্রসন্ন গরুড় কেতু ॥
করিতে আশা যিটো চিরকাল।
ন করিয়ো তাক ভঙ্গ গোপাল ॥
হরিলা চিত্ত ন থাকয় ঘরে।
হস্ত দুই গৃহ কৃত্য ন করে ॥
তোমাক এড়িয়া ন চলে ভরি।
ব্রজক গৈয়া কি করিবো হরি ॥
জ্বলে কামানলে তোমার গীতে।
নিবায়োক তাক অধরামৃতে ॥
নহি বিরহেতে দহিয়া তনু।
লভিবো তোমার সামীপ্য পুনু ॥
হয়োক প্রসন্ন জগনিবাস।
সব তেজি কৈলো তোমাতে আশ ॥
নমাবা পুলিয়া ঈষত হাসি।
পুরুষ ভূষণ করিয়ো দাসী ॥
অলকে আবৃত তোমার মুখ।
অধর সুধাক দেখন্তে সুখ ॥

ভ্রূর যুগ ভঙ্গ ঈষত হাসি।
দেখি তাক প্রভু ভৈলাহো দাসী॥
তোমার শুনিয়া অমৃত গীত।
হরিবে মোহ কোন স্ত্রীর চিত্ত॥
আছোক আন বৃক্ষ পশু পক্ষী।
প্রেমে পুলকিত তোমাক দেখি॥
দেবর রক্ষক যেন মুরারী।
ব্রজর তুমি দুঃখ ভয়হারী॥
শিরত হস্ত পদ্ম দিয়া দান।
কামে বশ্য হয়া গোপী যতেক।
বুলিলা বিহ্বল বাক্য অনেক॥
কৃষ্ণের কিঙ্কর শঙ্করে ভণে।
বোলা হরি হরি সমস্ত জনে॥

চতুর্থ কীর্তন ঘোষা—

গোবিন্দ দেব বিনে নাহি কেব।
গোবিন্দ দেব॥
গোপীর শুনিয়া আকুল বাণী।
ভৈলন্ত সদয় সারঙ্গপাণি॥
হাসিয়া বোলন্ত এড়িয়া তাপ।
গোপীক ক্রীড়িলা জগতবাপ॥
কৃষ্ণর সদয় দৃষ্টিক দেখি।
প্রফুল্ল ভৈলা যবে সখী॥
হরশি লীলা ভাব ভ্রূভঙ্গে।
কৃষ্ণের চৌদিশি বেঢ়িলা রঙ্গে॥
গোপীর মধ্যে শোভে দামোদর।
তারার মধ্যে যেন শশধর॥
গলত অম্লান পঙ্কজ মালা।
বেড়িয়া গুণ গাবে গোপবালা॥
আপনি গাবন্ত গীতমোহন।
ফুরন্ত রঙ্গ ত দিব্য বৃন্দাবন॥

যমুনা বালি দেখি সুকোমল।
পদ্মগন্ধী বাতে অতি শীতল॥
গোপীগণ লৈয়া নামিল তাত।
করিলা ক্রীড়া কৃষ্ণে অসংখ্যাত॥
বাহুলেলি কাকো আলিঙ্গে ধরি।
কারো তন নখে পরশে হরি॥
মুখ চায়া কারো তোলন্ত হাস।
মাতন্ত কাকো করি পরিহাস॥
লন্ত বস্ত্র কাঢ়ি বয়ায়া ঢঙ্গ।
বেকত করন্ত গুপুত অঙ্গ॥
ধরিয়া কারো কণ্ঠে বাহু মেলি।
করিলা অনেক অনঙ্গ কেলি॥
আনন্দে গোপীর বঢ়ায়া কাম।
রোমিলা গোপীনাথ অবিশ্রাম॥

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু শরৎকালীয় মহারাস

অভিসার কানড়া।

১। শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর ভোরণি
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ

বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু
একু কুণ্ডল দোলনি ॥
শিথিল ছন্দ নিবিক-বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি ।
ততহিঁ বেলি সখনি খেলি কেহ কা
কেহ কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি ॥

২। মল্লার
বিপিনে মিলল গোপ নারি
হেরি হসত মুরলিধারি
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেম সিন্ধু গাহনি ।
পুছত সবকু গমন খেম
করত কীয়ে কবর প্রেম
ব্রজক সবহু কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥
হেরি এছন রজনি ঘোর
তেজি তরুণি পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
ঘোর নহত কাহিনি
গলিত ললিত কবরি বন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ
বেচল বিপথ বাহিনি ॥
কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি

হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।
এতহু কহত না কহ কোই
রাখত কাহে মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গাহনি॥

৩। ধানশী

ঐ ছন বচন কহল যব কান
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করনি
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ
ভাঙ্গলি কুল শিল মুরলিক গানে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশ ধরি আনে॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল
ধাম্মিক হয়য়ে কুমারি নিচোল
তোহে সোঁপিতে জিউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবত মেল
শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল।
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস
কত কত পদুমিনি পঙ্কজ পাওত
মধুকর ধরম্প্রতি ভাব।
কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণী মণ্ডল মাঝ

যাবহি যাব রহাবয়রুমণি
আয়র নটরাজ
ধনি ধনি অপরূপ রসে বিহার
থীর বিজুরি মধ্যে সকল জলধর
রস বরি থয়ে অনিবার
কত কত চান্দ তিমিরপর বিলসই
তিমিরহু কত কত চান্দে
কত লতায়ে তমালহু কত কত
তুহু দুহু তনু তনু বান্ধে।
মধুকর মেলি কত পহু মিনি গাওত
মুগধল গোবিন্দ দাস

শঙ্করদেব রচিত পদাবলীর বড় গীতগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে। এর কতকগুলি ব্রজবুলিতে রচিত। বিরহ ও প্রার্থনার দু-একটি পদ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বড়গীত শঙ্করদেব

বিরহ

১। রাগ কল্যাণ, তাল—একতাল

উদ্ধব বন্ধো! মধুপুরী রহল মুরারু
কাহে রহব না হেরি অব জীবন
বন ভয়ো ভবন হামারু
যাহে বিয়োগ আগি অঙ্গ ভারয়
তিল একু রহয়ে না পারি।
সোহি ব্রজবর দূর গয়ো গোবিন্দ
দিশ দিশ দিবস আন্ধারি॥
ভায়ো মরণ ওহি সোহি হরি চরণুকু
বিছুরি রহয় না পারি
দেখত কালিন্দি গিরি বৃন্দাবন
তনু মন দহয় হমার॥

ব্রজ জন জীবন বাহুরি নাহি আবত
হামাকু করত অনাথা
গোপিনী প্রেম পরশি নীর ঝুরয়
শঙ্কর কহ গুণ গাথা ॥

২। মাধব ! বিরহে হরয় চেতন
তনু জীবন না রহে
চন্দ চন্দন মন্দ মলয় সমীরে
কেশব বিনে বিষ বরিষে শরীরে ॥
ঘন ঘন হানয় মদন পঞ্চবাণ
কোকিল কুহু কুহু লহ মেরি প্রাণ
পড়য় পাত অহিত হিমবারি
মধুকর নিকর করয় মহামারি ॥
আচিন সময়ে মধুপুরী পিউপ্রাণ
কৃষ্ণ কিঙ্কর রস শঙ্কর ভাণ ॥

প্রার্থনা

৩। পায়ে পরি হরি করহো কাতরি
প্রাণ রাখবি মোর
বিশয় বিষধর বিষে জরজর
জীবন না রহে থোর
অথির ধন জন জীবন যৌবন
অথির এহু সংসার
পুত্র পরিবার সবহি অসার
করবো কাহেরি সার ॥
কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল
থির নহে তিল এক ।
নাহি ভয়ো ভব ভোগে হরি হরি
পরম পদ পর ভেক ॥

কহতু শঙ্কর এ দুখ সাগর
পার করা হৃষীকেশ !
তুহু গতিমতি দেহ শ্রীপতি
তত্ত্ব পন্থ উপদেশ ॥

অঙ্কীয়ানাট।

আসামের ধর্ম ও সংস্কৃতির জগতে নবজাগরণ ঘটিয়েছিল শঙ্করদেবের যে রচনাবলী, অঙ্কীয়ানাট তার অন্যতম বলা যেতে পারে।

ভক্তি ধর্ম বা প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য এবং শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে মানুষের মন প্রাণ উদ্বেল করে তুলবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল অঙ্কীয়ানাট।

এর বিষয়বস্তু ভাগবত থেকে নেওয়া,

নায়ক—যুবক বা শিশু কৃষ্ণ,

নায়িকা—রুক্মিনী, সত্যভামা বা যশোদা,

মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা নন।

একটা বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে অঙ্কীয়ানাট রচিত হয়েছিল বলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়,—তার মধ্যে সর্বপ্রধান গীতিধর্মিতা।

বাস্তবিক পক্ষে নাটকত্ব বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই এর মধ্যে নেই, নাটকীয় সংলাপ অর্থে অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি, গান দিয়েই নাটকের সুরু এবং শেষ, কোনো কোনো গান আবার নৃত্য সম্বলিত।

গীতগুলি সবই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের স্তব, স্তুতি—তাঁর জয়গান, আশীর্বাদ ভিক্ষা, শরণাগতি, তাঁর পাদপদ্মে দেহ মন সমর্পণ, আত্মনিবেদন ইত্যাদি। এদের মধ্যে বড়গীত ও এদের শীর্ষদেশে রাগ ও তালের নাম দেওয়া থাকত। এই গীতগুলিকে বলা হত অঙ্কর গীত বা ভাটিমা।

সংস্কৃত নাটকের মত অঙ্কীয়ানাটেও নান্দী ও প্রস্তাবনা থাকত, তবে সংস্কৃত নাটকের নান্দী প্রস্তাবনা ও অঙ্কীয়ানাটের নান্দী, প্রস্তাবনার অনেক তফাৎ।

সংস্কৃত নাটকে সূত্রধর নান্দী পাঠ করে না।

অঙ্কীয়ানাটে নান্দী—পাঠই সূত্রধরের ভূমিকার বিশেষ অঙ্গ।

অঙ্কীয়া নাটে দুটি করে করে নান্দীশ্লোক—

প্রথমটি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনায় স্তোত্র, দ্বিতীয়টি সুদীর্ঘ পদ্যে বিষয়-বস্তুর বর্ণনা। একেই বলা হত ভাটিমা।

অঙ্কীয়া ভাবনায় নান্দী শ্লোক আবৃত্তির পর প্রস্তাবনায় প্রথমে সূত্রধরের একটি স্বর্গীয় ধ্বনি শ্রবণ—

তারপরে সঙ্গীদের সঙ্গে একটি আলোচনা, এই আলোচনার মাধ্যমে সূত্রধর কর্তৃক নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় প্রদান, এর পরেই সূত্রধরের সঙ্গীদের মঞ্চ ত্যাগ।

নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়াই গানের সঙ্গে সূত্রধরের নৃত্য করার রীতি ছিল এবং অঙ্কীয়া ভাবনায় কতগুলি বিশেষ নৃত্য প্রচলিত ছিল—সূত্রধর নাচ, কৃষ্ণ নাচ এবং গোপীনাচ।

অন্যান্য নাচগুলি—রাসনাচ, নাটুবানাচ, চলি নাচ।

অঙ্কীয়া ভাবনার—প্রারম্ভে নান্দীশ্লোক আবৃত্তির আগে গায়েন বায়েন দল সূত্রধরের নেতৃত্বে ধারাবাহিক ভাবে কতগুলি নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করতেন, এইগুলি সবই ভগবদ্ভক্তিমূলক শ্রীভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা বিষয়ক স্তব স্তোত্র। এ গুলিকে বলা হত ধেমালী বা রঙ্গগুলি রচিত হত, মূল নাটকের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।

শ্রী ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষামূলক নান্দীশ্লোক দিয়ে অঙ্কীয়া ভাবনার—আরম্ভ এবং মুক্তি মঙ্গল ভাটিমা দিয়ে শেষ। মুক্তি মঙ্গল ভাটিমায় সূত্রধরের নাটকের দোষ ত্রুটির জন্য শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।

অঙ্কীয়নাট রচনায় শঙ্করদেব ব্রজবুলি ভাষা গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে আভীর জাতীর ভূমিকা

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে রাসনৃত্যের বর্ণনা আছে, সে নৃত্য অতি প্রাচীন যুগে আভীর জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। আভীরদের—মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা কাহিনী পূজিত হয় এবং রাসনৃত্য আভীর সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ছিল। The Struggle for Empire"—গ্রন্থে H. C. Bhyani—বলেছেন "The Rasa had a long and varied past. It was known to several Puranas and Sanskrit Rhetorical works as a type of group dance, specially associated with the divine cowhered Krishna and Gopis and hence by implication also with the cowherd community of the Abhiras."

আভীর রমণীরা অতিশয় রূপ লাবণ্যবতী ছিল এবং আভীর জাতির নৈতিক চরিত্র ছিল শিথিল।

আভীরদের নিজস্ব ভাষায় রচিত কতকগুলি পদের নাম "বিরহ"। এই পদগুলির মধ্যে আভীরদের আশা. আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা, প্রণয়ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। আভীরদের নিজস্ব সঙ্গীতের সুর বর্তমানে ও আহেরী রাগ বলে প্রচলিত আছে।

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ গ্রন্থে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস সন্ধানে ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্তের বহু গবেষণাপ্রসূত মন্তব্য :—

"সমস্ত জিনিষ পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া; মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া-গান রূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্য সুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান ছড়ার মাধ্যমেই হয়তো এ গুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট

প্রসিদ্ধ লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।"

আভীর জাতীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তৃত আলোচনায় ডক্টর দাশগুপ্তের উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে।

আভীর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ইত্যাদিতে আভীর জাতীর উল্লেখ আছে। এইসব উল্লেখে আভীর জাতির বসতির স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও অনুমানে যা বোধ হয় তার সঙ্গে গ্রীসদেশীয় ভূগোলবিদ টলেমির আভীরদেশ সম্পর্কে বিবরণ এবং Periplus of the Erythrean Sea তে উল্লিখিত আভীরদেশ সম্পর্কিত বিবরণের মিল দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখসমূহ থেকে আভীর জাতি সম্বন্ধে যে ধারণায় উপনীত হওয়া যায় তা হলো আভীররা ছিল একটি যাযাবর গোপ জাতি। এরা ছিল সদাভ্রমণশীল, স্থান থেকে স্থানান্তরে ছিল এদের গতাগতি, এবং এদের জীবিকা ছিল দস্যু বা তস্করবৃত্তি। রামায়ণে এদের উগ্রদর্শন দস্যু বলা হয়েছে, মহাভারতে বৃষ্ণিরমণীদের অপহরণ করেছিল এরাই—

মহাভারতে মৌসল পর্বে এই হরণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারত—মৌসল পর্ব। ৮ম অধ্যায়।

সটীক অনুবাদ—হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ

কাননেষু চরম্যেষু পর্বতেষু নদীষু চ।
নিবসন্নানয়ামাস বৃষ্ণিদারান্ ধনঞ্জয়ঃ॥
স পঞ্চনদমাসাদ্য ধীমানতিসমৃদ্ধিমৎ।
দেশে গোপমুধান্যাঢ্যে—নিবাসম্ অকরোৎ প্রভুঃ॥
ততো লোভঃ সমভবদ্ দস্যূনাং নিহতেশ্বরাঃ
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নীয়মানাঃ পার্থেনৈকেন ভারত।
ততস্তে পাপকর্মাণো লোভোপহত চেতসঃ।
আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যা শুভদর্শনাঃ॥
অয়মেকোঽর্জ্জুনো ধন্বী বৃদ্ধবালং হতেশ্বরম্।
নয়ত্যস্মানতিক্রম্য যোধাশ্চেমে হতো ভাসঃ॥

ততো যষ্টি প্রহরণা দস্যবস্তে সহস্রশঃ।
অভ্যধাবন্ত বৃষ্ণীনাং তং জনং লোপ্ত্র হারিণঃ॥
মহতা সিংহনাদেন দ্রাসয়ন্তঃ পৃথগ্ জনম্।
অভিপেতু ধনার্থং তে কালপর্য্যায় চোদিতা॥
মিষতাং সর্বযোধানাং ততস্তাঃ প্রমোদত্তমাঃ।
সমস্ততোঽবকৃষ্যন্ত কামাচ্চান্যাঃ প্রবব্রজুঃ॥
জঘান দস্যূন্ সোদ্বেগো বৃষ্ণিভৃত্যৈঃ সহস্রশঃ।
ক্ষণেন তস্যাতে রাজন্ ক্ষয়ং জগমু রজিক্ষগাঃ॥
অক্ষয়াহি পুরা ভূত্বা ক্ষীণা ক্ষতভোজনাঃ।
স শরক্ষয়মাসাদ্য দুঃখ শোক সমাহতঃ
ধনুষ্কোট্যা তদা দস্যানবধীৎ পাক শাসনি।
প্রেক্ষতস্ত্বে ব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধক বরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সমন্তাজ্জনমেজয়।
ধনঞ্জয়স্তু দৈবং তন্মনসাঽচিন্তয়ৎ প্রভুঃ।
দুঃখ শোক সমাবিষ্টো নিঃশ্বাসপরমোঽভবৎ॥
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে যা তূণী ন ক্ষয়ং গতা।
আভীরৈরল্পকৈ সার্দ্ধং যুদ্ধে সাদ্যাগমৎ ক্ষয়ম্॥

অনুবাদ

অর্জুন ক্রমে মনোহর বন পর্বত ও নদীতীরে বাস করিয়া বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের ভার্যাদিগকে আনয়ন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধি ও প্রভাবশালী অর্জুন অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদ দেশে উপস্থিত হইয়া গো, অন্যান্য পশু ও ধান্য সম্পন্ন স্থানে বাস করিলেন। (ভারতনন্দন) তাহার পর একমাত্র অর্জুন লইয়া চলিয়াছেন—এহেন বিধবা স্ত্রীদিগকে দেখিয়া দস্যুগণের লোভ হইল, তদনন্তর পাপকর্মা, লুব্ধচিত্ত ও বিকটাকৃতি আভীরগণ উপস্থিত হইয়া মন্ত্রণা করিল। এই ধনুর্দ্ধর একমাত্র অর্জুন এবং এই সকল দুর্বল যোদ্ধা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া বালক বৃদ্ধ ও বিধবা স্ত্রীদিগকে লইয়া যাইতেছে। তদনন্তর শরঘাপহারী ও যষ্টিধারী সেই সহস্র সহস্র দস্যু বৃষ্ণিবংশসংপৃক্ত সেই লোকদিগের প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা কাল প্রেরিত হইয়া বিশাল সিংহ-নাদে নীচ লোকদিগের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া ধনের জন্য আসিয়া পড়িল।

তখন দস্যুরা সকল যোদ্ধার সমক্ষেই সকল দিক হইতে সেই উত্তম নারীগণকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছানুসারে দস্যুদের অধীন হইল। তৎপরে উদ্বিগ্নচিত্ত অর্জুন সহস্র সহস্র বৃষ্ণিভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহদ্বারা দস্যুগণকে বধ করিতে লাগিলেন। রাজা ক্ষণকালমধ্যেই অর্জুনের সেই বাণ সকল ক্ষয় পাইল। কি আশ্চর্য! রক্তপায়ী সেই বাণগুলি পূর্বে অক্ষয় হইয়া তৎকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। অর্জুন শরসকল ক্ষয় পাইয়াছে জানিয়া দুঃখ ও শোকে তাড়িত হইয়া তখন ধনুর অগ্রদ্বারা দস্যুগণকে বধ করিতে লাগিলেন। (রাজা জনমেজয়)। ম্লেচ্ছেরা অর্জুনের সমক্ষেই যাদবদিগের উত্তম স্ত্রীগণকে লইয়া সকল দিকে যাইতে লাগিল। তখন প্রভাবশালী অর্জুন সেই ব্যাপারটাকে দৈবকৃত বলিয়া মনে মনে ভাবিলেন এবং দুঃখশোকে আক্রান্ত হইয়া বিশাল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্রে কৌরবগণের সহিত মহাযুদ্ধে আমার যে তূণ বাণশূন্য হয় নাই, আজ ক্ষুদ্র আভীরগণের সহিত যুদ্ধে সেই তূণ বাণশূন্য হইয়াছে।

বোধহয় অনুমান করলে ভুল হবে না। ৪৯ সংখ্যক চর্যাপদে ভুসুক পাদ যে বঙ্গাল কর্তৃক সর্বস্বলুণ্ঠনের কথা বলেছেন এবং সেই বঙ্গালদের বর্ণনা করেছেন বয়াংসি বা পক্ষীজাতীয় বলে উড়ন্ত অর্থাৎ যাযাবর এরা সম্ভবতঃ আভীর জাতিরই সম্পর্কিত। আভীররা নানা স্থানে যাতায়াত করে বসতি স্থাপন করত, কোনো কোনো জায়গায় দুর্বলতর জাতির কাছ থেকে ভূমি কেড়ে নিত, যে সব দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল মানুষের অনধিগম্য সেই সব অঞ্চল অধিকার করে রাজা হয়ে বসত। বহু শিলালিপিতে প্রবল পরাক্রান্ত আভীর জাতির বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে। "Asiatic Researches Vol. IX." গ্রন্থে বিখ্যাত ঐতিহাসিক W. Richardson পাল রাজাদের আভীর বলে অভিহিত করেছেন "The Pal or Shepherd dynasty ruled in Bengal from the 9th to the later part of the 11th Century and if we place trust in the monumental inscriptions, the Abhirs were for sometimes the Universal monarcs of India." (Asiatic Researches Vol. IX, Page 438)

আভীর জাতি সম্বন্ধে Sir Henry M. Eliot তাঁর "Memoirs on the History, Folklore, and Distribution of the races of the

North Western Provinces of India" গ্রন্থে বলেছেন—"Ahirs were also at one time Rajas of Nepal at the beginning of our era and they are perhaps connected with the Pala or shepherd dynasty, which ruled in Bengal from the eleventh Century".

২৫০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিকের গুহায় খোদিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে শাতবাহনরাজ্য যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভক্ত হতে থাকে তখন সমস্ত রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আভীর জাতীয় দলপতি ঈশ্বর সেন রাজত্ব স্থাপন করেন। আভীর-আধিপত্যের নিদর্শন হিসাবে আভীর অব্দের উল্লেখ করা যায়। এই অব্দ পরে কালাচুরি চেদি অব্দ নামে খ্যাত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আভীরদের সন্ধান মেলে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে তারা গুজরাটের শকদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শতবাহন রাজ্য ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গেই খন্দেশ এ নিজ রাজত্ব স্থাপন করে।

আভীরদের স্থান পরিবর্তন খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয় এবং এই সময়েই মহাভারতের ভূগোল অংশ—ভুবনকোষ ও পুরাণ গ্রন্থগুলি রচিত হয়।

আভীররা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন করত, সেইখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যেত এবং গোপবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি জীবিকা অবলম্বন করত। আভীররা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেলেও তাদের নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি ও সংস্কার দৃঢ়ভাবে রক্ষা করত। এর ফলশ্রুতি হিসাবে বলা চলে যে এখনো কতকগুলি জায়গায় কতকগুলি জাতি নিজেদের আভীর বংশীয় বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের মধ্যে এখনো আভীরদের ধর্ম সংস্কৃতি বজায় আছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বর্তমানে বেলগাঁও, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, মালব, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং বাঙ্গালার আভীর জাতিসমূহ মথুরাকে নিজের মাতৃভূমি বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের জাতিগত ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি একই, এই ধারণা ঘোষণা করে।

তামিল শাস্ত্রগ্রন্থ "সঙ্গম"-এ কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের নৃত্যের বর্ণনা আছে। এবং প্রাচীন তামিল সাহিত্যে আভীর শব্দের পরিবর্তে "আয়ার" শব্দ ব্যবহৃত

হয়েছে। বর্তমানকালে ও সৌরাষ্ট্র প্রদেশে আভীরগণ "আয়ার" নামে পরিচিত।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাসে আদিপর্বে বাঙালীর বর্ণ বিন্যাস প্রসঙ্গে লিখেছেন—আভীররা বিদেশাগত প্রাচীন কৌম এবং ভারতেতিহাসে সুবিদিত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ—মতে উহারা মধ্যমসংকর পর্যায়ভুক্ত আর কোনো বিদেশী কৌমের পক্ষে কিন্তু এতটা সৌভাগ্য লাভ ঘটে নাই।

একাধিক ঐতিহাসিকের মতে আভীর জাতির সঙ্গে পাল রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং পাল কথাটি সম্ভবতঃ গোপাল কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

আভীর জাতির সঙ্গে পাল রাজারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের এই মতানুসারে অনুমান হয় যে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন বাঙ্গালা-দেশ পাল রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সময়েই আভীর সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ রাস নৃত্য এবং বিরহ-গীতগুলি বাংলাদেশে প্রচলিত হয়। এর থেকে ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্তের অভিমতকে সমর্থন করা যায় যে "ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা, তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া গান রূপে ছড়াইয়া ছিল।"

অধ্যাপক সূর্যবংশী তাঁর অতি বিস্তৃত গবেষণা গ্রন্থ "Abhiras ; their History & Cultur গ্রন্থে ভাগবতে বর্ণিত রাস নৃত্যে গোপরমণীদের চিত্র পরিকল্পনায় আভীররমণীদের রূপলাবণ্য এবং নৈতিক চরিত্রের শৈথিল্য খোরাক যুগিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

আভীর জাতির মধ্যে প্রচলিত রাস নৃত্য এক প্রকার মণ্ডলী নৃত্য,—এই প্রকার নৃত্য অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল—এবং এখনো প্রচলিত আছে,—তবে ভাগবতে যে শৃঙ্গাররসাত্মক রাস নৃত্য বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ নৃত্যের মধ্যেই চুম্বন, আলিঙ্গন, রতিক্রীড়া ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে,—এর একটা কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

রতিক্রীড়াযুক্ত নৃত্য প্রচলিত ছিল এশিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠিত গ্রীকদেবী Aphrodite (এফ্রোডাইটির) মন্দিরে এবং গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে গ্রীক দেবতা Dionysus (ডায়োনিসাস্) "Nymphs" বা পরীবেষ্টিত হয়ে নৃত্য করতেন এই রকম বিবরণ পাওয়া যায়।

সিন্ধুনদের তীরে ভারতীয় গ্রীকদের পাশেই আভীররা তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করে, এবং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরেই গ্রীক সেনাপতিরা

আভীর দেশ দখল করে। বলাই বাহুল্য ভারতীয় গ্রীকদের সঙ্গে আভীর জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর ফলে গ্রীকদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আভীরদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।

আভীরদের একটি নিজস্ব ভাষা ছিল, 'আভীরী'; সাহিত্য দর্পণে এবং দণ্ডীর কাব্যাদর্শে এই ভাষার উল্লেখ আছে।

সাহিত্য দর্পণে—আভীরী ভাষার উল্লেখ

সাহিত্য দর্পণ : ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

অথ ভাষা বিভাগ :—

আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপাত্রোপজীবিষু।

অর্থ

আভীর গণের ভাষা হইবে আভীরী এবং চণ্ডাল প্রভৃতিগণের ভাষা হইবে চাণ্ডালী কাষ্ঠোপজীবী আভীরভাষা এবং পত্রোপজীবী শাবরী ভাষা ব্যবহার করিবে।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে আভীর ভাষার উল্লেখ

কাব্যাদর্শ। দণ্ডী। প্রথম পরিচ্ছেদ—। শ্লোক—৩৬।

আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষপভ্রংশ ইতি স্মৃতাঃ।
শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়োদিতম্।

অর্থাৎ কাব্যনাটকে আভীরদিগের ভাষাকে অপভ্রংশ বলা হয়, বস্তুতপক্ষে সংস্কৃত ভিন্ন যে কোনো ভাষাকেই অপভ্রংশ বলা হইয়া থাকে।

উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ এবং খন্দেশে যখন আভীররা বসতি স্থাপন করে, তখন তাদের ভাষার সঙ্গে সেই সব অঞ্চলবাসী জনগণের ভাষা মিশ্রিত হয়ে কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার কয়েকটি—যেমন কান্দরা পার্বত্য অঞ্চলে গডিড বা কান্দরী; মধ্যপ্রদেশের কয়েক জায়গায় গৌড়ী প্রচলিত আছে। এই সব প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে আভিরাণি—সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। আভীরদের নিজস্ব সঙ্গীতের সুর বর্তমানেও আহেরী রাগ বলে প্রচলিত আছে। উপরোক্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলি এবং আহেরী রাগ আভীর সংস্কৃতির সাক্ষ্য এমন ভাবে বহন করেছে যে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আভীররা যাযাবর জাতি হলেও ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

তাদের স্বাতন্ত্র্য এমন দৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছিল যে তাদের বংশধরদের মধ্যে তার চিহ্ন বৃত্তায় এখনো বজায় আছে।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আভীরদের উল্লেখ

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমগ্র ভারতবর্ষের বর্ণনা কালে সঞ্জয় প্রথমে ভারতবর্ষের নদনদীগুলি বর্ণনা করে পরে দেশগুলির বর্ণনা করলেন। এই বর্ণনার মধ্যে আভীর জনপদের উল্লেখ আছে :—

বাহ্লীকা কটাধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কা : এবং

ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্র কুলানি চ

শূদ্রাভীরাশ্চ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশুভিঃ সহ।

মহাভারতের সভাপর্বে একটা শ্লোক আছে—

গণানুৎসব সংকেতান্ব্যজৎ পুরুষর্ষভঃ

সিন্ধুকালাশ্রিতা যে চ গ্রামণেয়া মহাবলা

শূদ্রাভীর গণাশ্চৈব যে চা শ্রিত্য সরস্বতীম্।

বর্ত্তয়ন্তি চ যে মৎস্যৈর্যে চ পর্বত বাসিনঃ॥

এই শ্লোকে আভীরদের বিভিন্ন বসতির উল্লেখ আছে—একটি সরস্বতী নদীর তীরে, অপরটি সিন্ধু নদীর তীরে, তৃতীয়টি মৎস্য প্রদেশে, এবং চতুর্থটি পার্বত্য অঞ্চলে সিন্ধুনদী বর্তমানে River Indus এবং সরস্বতী—বর্তমানে ঘর্ঘরা সুরতগড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে এর স্রোত হারিয়ে গেছে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে। সিন্ধুনদীর তীরে আভীর বসতি নির্দিষ্ট ভাওয়ালপুর রাজ্যের দক্ষিণে—যেখানে আলেকজাণ্ডারের সময়ে শূদ্রদের বসতি ছিল।

সরস্বতী নদীর তীরে আভীর বসতির সমর্থন পাওয়া যায় মহাভারতের শল্য পর্বে। উল্লেখ যে শূদ্রদের প্রতি ঘৃণাবশতঃ সরস্বতী নদী বিনশনে অন্তর্ধান করে। মহাভারত ॥ শল্য পর্ব্ব ॥ বিনাননাদি তীর্থকথা ॥

মহাভারত—শল্যপর্ব্ব। অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়॥ বিনশনাদি তীর্থকথা—অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে মহারাজ, অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশন তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় সরস্বতী শূদ্র ও আভীরদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন উবাচ—

ততো বিনশনং রাজঞ্জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্‌প্রতিদ্বেষাদ্‌যত্র নষ্টা সরস্বতী
তস্মাত্তু ঋষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি চ।

এই উল্লেখ থেকে অনুমান হয় যে আভীরদের বসতি ছিল সরস্বতী নদীর তীরে বিনশনের চারিদিকে। রাজস্থানের শীর্ষদেশে বিনশনের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে।

এর পরের পর্বে আভীর বসতির উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের ভীষ্মপর্বে —যেখানে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাত্যদের গণ বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের মত পুরাণগুলিতেও আভীরদের নানা বসতি বর্ণনায় আগ্রহ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে—দক্ষিণাপথ বাসী আর্যেতর জাতির তালিকায় আভীর জাতির উল্লেখ আছে।

পুরাণগুলিতে গুজরাটে আভীর বসতির বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায় না। আভীর সেনাপতি রুদ্রবিভূতির শিলালিপি থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে আভীররা গুজরাটে বসতি স্থাপন করে এবং ঈশ্বরসেনের শিলালিপি খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকের মধ্যে খন্দেশ এ আভীরদের দুর্গ স্থাপনের সাক্ষ্য দেয়।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে আভীর জাতি খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে মহারাষ্ট্রে বসতি বিস্তার করেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আভীর জাতি দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান এবং উত্তর-পূর্ব সিন্ধুদেশে বসতি স্থাপন করে এবং তখন থেকে এইসব জায়গার নাম হয় আভীরদেশ। আভীরদেশের অস্তিত্বের প্রাচীনত্ব খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর আগে নির্দিষ্ট করা যায় না। তার কারণ গ্রীসদেশীয় ভূগোলজ্ঞ টলেমি (Ptolemy) এই সময়েই আভীর দেশের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করেছেন। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক সূর্যবংশীর "Abhiras" Their History & Culture........গবেষণাগ্রন্থে টলেমির বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া আছে:

"And further all the country along the rest of the course of Indus is called by the general name of Indo-skythia. Of this, the insular portion formed by the bifurcation of the river towards its mouth is Palatene and the region above

this is "Aberia" and the region about the mouths of the Indus and Gulf of Kanthis is Syrastrene."

(M. C. Crindle J. W. Ancient India as described by Ptolemy, Bombay 1885).

অধ্যাপক সূর্যবংশীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ—"Peripulus of the Erythrean Sea"র বিবরণ এইরূপ দেওয়া আছে—"The Periplus of the Erythrean Sea" locates the country of Aberia adjacent to Saurasthra, its location has been described as follows:

"To the Gulf of Barake succeeds that of Barygaza and the main land of Ariake, a district which borderson Shythia, is called Aberia and its sea-board Saurastrene."

(M. C. Crindle : Translated from the Text as given in the Geography Graea Minores edited by C. Mutter. (Paris) Schoff W. H. The Periplus of the Erythrean (London, 1912), Periplus of the Erythrean Sea-র লেখক আভীর-বসতির সঠিক নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিত Gulf of Barake এবং Gulf of Cambay একই এবং Barygaza……হচ্ছে Broach ; এতে নির্দিষ্ট হয় "Ariake" স্থান। Periplus (পেরিপ্লাস) এর বর্ণনার সঙ্গে টলেমির বর্ণনা মিলে যাচ্ছে এবং আবেরিয়া বা আভীরদেশের সঠিক সীমা নির্দেশ করা চলে যে আবেরিয়া বা আভীরদেশ—ছিল সিন্ধুনদীর উত্তর দ্বীপাঞ্চল, এবং এর দক্ষিণ সীমা ছিল সৌরাষ্ট্র যার অন্তর্গত ছিল দক্ষিণ পশ্চিম রাজস্থান।

রামায়ণে যদিও আভীর বসতির কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবু দ্রুম কুল্য বা মরুকান্তার বলে যে অরণ্যের উল্লেখ আছে, রামচন্দ্র যে অরণ্যের দিকে অগ্নিময় শর নিক্ষেপ করেছিলেন, আভীরদের বাসস্থান বলে সেই অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশ এবং thar Parkar এবং Marwar একই স্থান—টলেমি এবং পেরিপ্লাস বর্ণিত আবেরিয়া।

রামায়ণে যুদ্ধ খণ্ডে রামচন্দ্রের উক্তি

উত্তরেণাবকাশোঽস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম
দ্রুমকুল্য ইতি খ্যাতো লোকে খ্যাতো যথাভবান্।

উগ্রদর্শন কর্ম্মণো বহব স্তত্রে দস্যব:
আভীরপ্রমুখা: পাপা: পিবন্তি সলিলং মম

পুরাণগুলিতে উল্লিখিত ভৌগলিক বিবরণের সঙ্গে টলেমি এবং পেরিপ্লাসের বিবরণ একেবারে মিলে যায়। বিষ্ণুপুরাণে আভীরদেশ সৌরাষ্ট্রের সংলগ্ন বলে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সীমা নির্ধারিত হয়েছে পরিযাত্রা পর্বতোপরি অর্ব্বুদ এবং মালব পর্যন্ত। পরিযাত্রা এবং আরাবলী একই পর্বতমালা।

তথা পরান্তা: সৌরাষ্ট্রা: শুরাভীরাস্তথার্ব্বুদা:
মালকামাবলাশ্চৈব পরিয়াত্রা নিবাসিন: ॥
বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩ ১৬-১৭

বরাহমিহিরের বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে মিলে যায়। বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত আভীরদেশ সৌরাষ্ট্র আনর্ত, অর্বুদ এবং পুষ্করের সংলগ্ন—"আনর্তাবুর্দ পুষ্কর সৌরাষ্ট্রাভীর শুদ্ররৈবতকা নষ্টা যস্মিন দেশে সরস্বতী পশ্চিমোদেশ: ॥" ভাগবত পুরাণের বর্ণনায়ও আভীর দেশ সৌবীর (Sind) আনর্ত গুজরাট এবং অবন্তী সংলগ্ন।

মরু ধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়ো: পরাণ ॥ ভগবত পুরাণ ১, ১০ ৩৫ ॥
সৌরাষ্ট্রবন্ত্যাভীরাশ্চ শূদ্রা অর্বুদামালবা: ॥ ভগবত পুরাণ, ১২,১,৩৮ ॥

উপরোক্ত বিবরণসমূহ থেকে আভীর দেশের সীমা নির্দিষ্ট করা যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শের টিকাকার তরুণ বাচস্পতি বলেছেন—

পশ্চিম পার্শ্ববর্তী জনপদ:
আভীরাদি দেশোনাম আভীর প্রায়:
পশ্চিম পার্শ্ববর্তী জনপদ:।

অর্থাৎ আভীরদেশ ছিল সিন্ধু নদীর উত্তরে :—থীপাকর (Thar Parkar) এবং Hyderabad Sind থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান ॥ মারওয়াড়, পুষ্কর সম্পূর্ণ পশ্চিম রাজস্থান, মালব এবং সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত।

হরিবংশে ॥ ভবিষ্যপর্ব। আভীরদেশ মদ্ররাজের সংলগ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে—"মদ্রকাভীর:" খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও বরাহমিহির আভীর জাতির উত্তর পশ্চিমাগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন—

কুমেইস্তগিরিজান্ স পশ্চিম জনান্ ভারতুহান্ তস্করান্।
আভীরাদরদাইর্ষ্যা সিংহপুরকান্ হত্যাতথা বর্বরান্ ॥
(Keru সম্পাদিত বৃহৎসংহিতা, শ্লোক ৭২)

Keru বৃহৎসংহিতার তারিখ দিয়েছেন—
৫০৫ খৃষ্টাব্দ।
আভীর জাতির উত্তর পশ্চিমা গোষ্ঠীর
বংশধরেরা এখনো একই অঞ্চলে বাস করেন।

এঁরা "গড্ডি" নামে পরিচিত, এবং এরা কাংরা এবং চম্বার মধ্যবর্তী তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে বাস করেন। এঁরা কৃষিজীবী ভূস্বামী, এবং অনেক জাতিতে বিভক্ত। মথুরাবাসী আভীরদের সঙ্গে এঁদের অবয়বের সাদৃশ্য আছে।

The Age of Imperial Unity Vol. II······গ্রন্থে আভীরদের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া আছে—The Abhirs appear to have been a foreign people, who entered India shortly before or along with the Sakas from some part of eastern Iran. It is tempting to connect their name with the locality called Abiravan between Herat and Kandahar. The puranas speak of the Abhiras amongst the Successors of the Satavahanas.

Although we have an Abhir settlement as far east as Ahirwar between Bhilsa and Jhansi in Central India, the Abhira people is usually associated with Aparanta which indicated in a wider sense the western division of India and in a narrow sense only the northern part of the Kankan. In one text, the Mahabharat places the Abhiras in Aparanta but in another it associates the people with the Sudras and assigns both the tribes to the land near Vinasana where the Saraswati lost itslef in the sands of the Rajputana desert.

The Abhiras are also found in association with the Sudras in Patanjali's "Mahabhasya"—The periplus of the Erythrean Sea and The Geography of Ptolemy locate Aberia or Abiria, the Abhir country between the lower Sindhu Valley and

Kathiawar apparantly South Western Rajputana and the adjoining regions.

The dominions of the Abhira Kings referred to, in the Puranas however lay in the north west region of the Deccan and may have included the northern Kankan as far as Broach area in the north.

In early epigraphic records, the Abhiras figure as generals of the Saka Mahakshatrapas of India.

The "Gunda" (North Kathiwara) inscription of A. D. 181, belonging to the time of Rudra Sinha I, records the digging of a tank by the Abhira general Rudra Bibhuti son of the general Bapaka.

We know only one Abhira king may be regarded as a successor of the Satavahanas and the Sakas in the North Western Deccan. He is Raaja Mathuraputra Isvarasena, son of Abhira Sivadatta mentioned in the Nasik inscription (250 A. D).

As the king's father Sibadatta is credited with no royal tittle in the inscriptions, kins' Isvarasena may be regarded as the founder of Abhira dynasty of kings.

There is no doubt that this king flourished. Some time after the death of Sajna Satakarni which took place about the third century A. D.

The inscription of Isvarasena proves that his dominions comprised the Nasik region in northern Maharashtra but the actual extent of his kingdom is uncertain.

It is not improbable that the so called "Kalachuri" or "Chedi" era starting from 248—249 A. D. was counted from the accession of Isvarasena.

Although the Puranas refer to ten Abhira Kings, ruling

for 67 years, nothing is known about Isvarasena's successors.

The Abhiras may have extended their political influence over Aparanta and Lata, where the era was found to be in use in later days.

The Abhiras continued to rule as late as the middle of the fourth century A. D. According to the Allahabad inscription of Samudra Gupta, the Abhiras were subdued by the Gupta Emperor and the Abhira territories appear to have later passed to the Trikutakas.

W. Richardson "Indian Caste & Tribes "Vol. I (P. 282) গ্রন্থে বলেছেন—If monumental inscriptions can be trusted, the Abhiras were for some time the Universal Monarchs of India.

আভীর জাতীর পরিচয়

আভীর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না তবে কৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকায় আভীররা যদুবংশোদ্ভূত এই কথা বলা হয়েছে—

"পশুপালাশ্রিধা বৈশ্যা আভীরা গুর্জরাস্তথা-
গোপপল্লব পর্য্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবা।"

Robert Shafer—তাঁর "Ethnolgraphy of Ancient India" গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, মহাভারতে উল্লিখিত যদুবংশ যে মানব জাতি থেকে উদ্ভূত তারা ছিল ইরাণীয়।

Rebert Shafer তাঁর "Ethnography of Ancient India" গ্রন্থে লিখেছেন—"I am inclined to believe that Western Manavas at Anarta were Iranians. The Iranians were the closest people on the West of India, that we know any thing about and nearly half of the Mahenjodaro skulls which could be classified, belonged to the Mediterrancan (Humitic Iranian) type, today a deminant dement in the north of India and generally among the upper Social classess.

At Mahenjodaro was found the Sculptured head of a man

with a short beard (chin whiskers). "A chin whiskered beard" was a characteristic of many persians in their sculptures and the paplavas are distinguished in the Mahabharata from other people by beards.

যদুবংশের উদ্ভব সম্বন্ধে—Robert Shafer তাঁর গ্রন্থে ("Ethnography of Ancient India") লিখেছেন—

"According to the Yadava's own history they were discended from the first race of India, the Manava and from the demon-kind "Madhu."

I think we must interprete the Yadavas account their origin as that the Manavas (Iranians) were subjugating the Bhils and the Yadavas were their descendents.

* * *

Yadu founded seven clans, according to the Yadava-history—the Bhaima, Kankura, or Satavata, Bhoja, Andhaka, Yadava, Dasarha and Vrisni. The Vrisnis and the Andhak as were branded as Vraty as in the Mahabharata, and Krishna himself was so regarded and the Saurashtra Kings were considered as Vraty as and mostly Sudra (Black) in the Puranas. Bandhayana states in his "Dharmasastra" that the inhabitants of Anarta and Saurashtra are of mixed origin.

"Tne periplus of the Erythrean Sea" calls either the "Saurashtras" or the "Abhiras" or both men of great Statare and black in colour, which would indicate a mixture of a tall race with the black Nishads (Bhills) and further absorption of the latter.

The Yadavas occupied former Madhava territory at Saurashtra, Anarta and Mathura and the outcast status was no doubt due to their inter mixture with the Bhils.

The Haihayas are considered branch of the Yadavas and we find Pahlavas, Sakas and Kambojas (All Iranians) associated with the Haihayas in an attack on Ayodhya.

"The Age of Imperial Unity Vol. II" গ্রন্থে আভীরদের সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তাদের ইরাণীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে—"The Abhiras appear to have been a foreign people, who entered India shortly before or along with Sakas from some part of eastern Iran, It is tempting to connect their name with the locality called the Abiravan between Herat and Kandahar.

E. T. Datton তাঁর "Descriptive Ethonology of Bengal. Section 4 Pastoral Tribes ; the Gopas." গ্রন্থে আভীরদের সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Of the Abhirs or gopas who were the companions of the youth Krishna at Mathura, we have various accounts.

It is contended by some authorities that they were Vaisyas, but the Brampavaivarta Purana makes out that whole, group that sported in Brindavana were gods and goddessess, out masquerading."

উপসংহার

উপসংহারে এই বলা যায় যে প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস সন্ধানে যে মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বত্র রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক যে সব পদ পাওয়া যায়, তার মূলে আছে আভীর জাতির মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি রাখালিয়া গীত—এই মন্তব্যটি দু দিক থেকে প্রমাণ করা চলে—প্রথমতঃ আভীর জাতির মধ্যে যে গীত প্রচলিত ছিল, এবং সেগুলির যে একটি নিজস্ব সুর ছিল, তার প্রমাণ মেলে "আহেরী" রাগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মধ্যে ; বর্তমানেও "আহেরী" নামে একটি রাগ প্রচলিত আছে। আভীরদের মধ্যে যে গীতগুলি প্রচলিত ছিল, তার প্রাচীন রূপ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, তবে সৌরাষ্ট্র প্রদেশে বর্তমানে আভীর জাতির বংশধরদের আঞ্চলিক ভাষায় যে লোকসঙ্গীতগুলি পাওয়া যায়, তার থেকে এই সব গীত সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ডক্টর দাশগুপ্ত সর্বভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার মধ্যে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি প্রেম সঙ্গীতের সঙ্কলনের উল্লেখ করেছেন। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বলে ডঃ দাশগুপ্ত হালের "গাহা সত্তসঈ" এর উল্লেখ করেছেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট তার "হর্ষচরিত" গ্রন্থে কয়েকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম করেছেন—সেখানে সাতবাহন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—লোকে যেমন বিশুদ্ধজাতি রত্নের দ্বারা কোশ (ধনকোশ) নির্মাণ করে, সাতবাহন রাজাও সেইরূপ সুভাষিতের দ্বারা অবিনাশী এবং অগ্রাম্য কোশ নির্মাণ করিয়াছিলেন।" সুতরাং হাল-সঙ্কলিত এই গাথাগুলি এবং তৎসহ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিকের গুহায় খোদিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সাতবাহন রাজ্য যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভক্ত হতে থাকে, তখন সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আভীর জাতীর দলপতি ঈশ্বরসেন আভীর রাজত্ব স্থাপন করেন।

দণ্ডীর কাব্যদর্শে আভীরদের ভাষাকে বলা হয়েছে "অপভ্রংশ" এবং খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও বরাহমিহির আভীর জাতির উত্তর-পশ্চিমাগোষ্ঠির উল্লেখ

করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে হালের "গাহা"—সত্তসঈতে "রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার যে পদগুলি সঙ্কলিত হয়েছে, যেমন—একটি পদ—পচ্চন—সলাহরনিহেন পাসপরিসং ঠিআ নিউণ গোবী সরিস গোবী আণ চুম্বই কবোল পড়িমাগঅং কহ্নম্" অর্থাৎ "নৃত্য প্রশংসার ছলে পাশ্বগতা কোনো নিপুণা গোপী সদৃশ—গোপীগণের কপোল প্রতিমাগত কৃষ্ণকে চুম্বন করিতেছে।" এই ধরণের কিছু পদ আভীর জাতির কাব্যিক অবদান হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা উপরোক্ত পদের গোপী চিত্রের সঙ্গে ভাগবতে বর্ণিত রাসবর্ণনায় নৃত্যরতা গোপীদের চিত্রের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে এই অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে সর্বভারতীয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস ভাগবত, বিশেষত: ভাগবতে বর্ণিত রাসপঞ্চাধ্যায় এবং আভীরদের রচিত রাখালিয়া গীতাবলী।

সৌরাষ্ট্র প্রদেশের মৌখিক আঞ্চলিক
কাথিওয়াড়ী ভাষায় রচিত লোকসঙ্গীত।

(অনুবাদ—লেখিকা)

গান (ঈশারা)

মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল।
সাঁভরতা ব্যাকুল থয়ি ব্রজনি নারী যো॥
মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল।
পাণিডানে মসেরে গোপী জোয়া নিসরিরে লোল।
বেঠু মূক্য সরোবরণি পাড় যো।
উটাণী বরগাড়ি আম্বা ডাল যো॥
মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল।
নীরনে ভুলিরে হরিনে শোধতারে লোল।
ন দে খুঁ ক্যাঁয় নন্দজীনে লাল যো।
মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল॥

সখি। এ মানলতা হড়বে হুঁ আবে মাহিরে লোল।
আমে করতা জপ তপ তিরথ দান যো
মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল।
সফল থয়ো জন্মারো সখি।
আঁখলী কী ধী মুখনে দান যো
মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল।
সখি। যো তানে যো তারে মলিয়া কৃষ্ণ মারে লোল
সামলিয়া প্রভু সোঁপিয়া তনে প্রাণ যো॥
মিঠিনে বাগেরে বনমা বাঁশড়ীরে লোল॥

অনুবাদ

বনের মাঝে বাজে বাঁশী মধুর সুরে অতি।
ব্যাকুলিত হয় শুনে ব্রজের যত নারী॥
মধুর সুরে বাজে বাঁশী বনের মাঝে অতি
জল আনবার ছলে যায় গোপী
দেখবে বলে শ্রীকৃষ্ণ বয়ান
কলসী রেখে সরোবরের পাড়ে
উড়নী রেখে আমের ডালে
জল ভুলে হরিকে খোঁজে গোপী
কোথাও তো নেই সে নন্দের নন্দন।
মধুর সুরে বাজে বাঁশী পূর্ণ করে বন॥
সখি। আসবে নাকি সেই মানুষটি চুপি চুপি
আমি যে করি জপ তপ তীর্থে এত দান।
মধুর সুরে বাজে বাঁশী বনের মাঝে অতি
সখি। এক পলকে জন্ম আমার সফল হল

মোক্ষ

কানারে তমে ছানামানা মারে ঘের রে।
সমঝো জীবন সান মা কহুঁ
ওধারে শী পের ॥
কানারে তমে ছানামানা মারে ঘের রে ॥
তমো বিনা মারা জীবন সুনা
জীবতর লাগে জের
তমো দিঠি এ মারে ছুনিয়া বসে
তমো সু লীলা লহের ॥
কানারে তমে ছানামানা মারে ঘের রে ॥
অন্তর পীড়া পারখো নহি
আওড়া শা অন্ধের রে°।
স্নাজু তাণে ত্রিকোম জী
কাঁচী সুতোর সের রে ॥
কানারে তমে ছানামানা মারে ঘের রে ॥
মিঠলডা মারে মন্দির আও
মাবা ! করিশে মেহের রে
নহি আও বো নন্দনাথ ছৈয়া
কৃষণে রাখুঁ বের রে ॥
কানারে তমে ছানামানা মারে ঘের রে ॥

নিমন্ত্রণ

অনুবাদ

লুকিয়ে কেন এসোনা কানু। আমার ঘরে
ইঙ্গিতে বলি জীবন আমার
বেশী আর বলি কেমন করে
লুকিয়ে কেন এসো না কানু ! আমার ঘরে
তুমি বিনা হায় ! শূন্য জীবন
জীবনের স্বাদ লাগে বিষের মতন
পাই যে জীবন মেহারি তোমারে

ভরে চারিদিক আনন্দ লহরে
লুকিয়ে কেন এসো না কানু ! আমার ঘরে ।
অন্তর পীড়া বোঝনা যে হায় !
অবুঝ কেন তুমি এমন রে !
টানলে বেশী ছিঁড়ে যাবে যে ত্রিভঙ্গ !
কাঁচা সুতার ডোর রে ॥
লুকিয়ে কেন এসো না কানু ! আমার ঘরে
মধুর ! আমার মন্দিরে এসো
মাধব করুণা কর আমারে রে
না আসলে যদি নন্দের নন্দন ।
কব না কথা আর তোমার সনে
লুকিয়ে কেন এসো না কানু আমার ঘরে ॥

সাঁভর সারি বাত

আহের বা ভরো আওরে
এক বাত কহুঁ তারা কান মারে ॥
তু সাঁভর মারি বাত রে
হুঁ সমঝাউঁ তনে সান মরে ॥
এক বাত কহুঁ তারা কান মারে
রঙ্গ ভরয়া মেন নাচাভরে হুঁ
দৌড়ি আঁমু তারি সান মারে ।
তন না তাপ সমায়ো রে
আও শীদ ভইরো-অভিমান মারে ॥
এক বাত কহুঁ তারা কান মারে ।
এ্যাল্যা গিরিধারী মনে ঘেলি কী ধী
তোই ন লিধোমে মে উআক-করে
কানা তারি বাঁশড়ী এতো
অ্যাডে ভইরো আঁক রে
এক বাত করুতে সাঁভরতা

মারুকি যু মাক্সিন্ ভো
আও সে তুরনে সার রে ॥
কে দাড়ে যে নিরখিও তুরনে
খপ্নে ন ধরিও শোক রে।
তনমন সৌ যে তুরনে সোঁ পিউ
লওয়ে সৌ ছুরীজন লোক রে।
এক বাত কহুঁ তারা কান মারে ॥
সাবরিয়া প্রভু। পাতরিয়া!
সৌ হও য়ে পুরো আমারা কোর
দেহভবন মা রসরঙ্গ ওয়াধিও
মরিয়া নন্দ কিশোর রে

শোনো আমার কথা

অনুবাদ

আহের। কাছে এসো ওরে।
একটা কথা বলি তোমার কানে॥
শোনো আমার কথা তুমি
ইঙ্গিতেতেই বোঝাই যারে॥
একটা কথা বলি তোমার কানে।
রঙ্গভরা নয়ন যবে নাচাও তুমি ওরে।
ইঙ্গিতে তার দৌড়ে আসি আমি
আগুন লেগেছে শরীরে আমার
কেন দূরে থাক অভিমান ভরে
একটা কথা বলি তোমার কানে।
এই গিরিধারি! যদিও আমারে
পাগল করেছ তবুও তোমারে
দোষ দিই নাই, বাঁশীতে তোমার
উলটী পালটী যা কিছু আমার
হায় করে দিল সব একাকার॥

একটা কথা বলি তোমায় আমি
মান যদি, চতুর হবে তুমি ॥
যেদিন দেখেছি তোমারে আমি যে
স্বপ্নেও শোক ভুলেছি রে
তনু মন সব স'পেছি তোমারে
দুরজন এই রটায় রে ॥
একটা কথা বলি তোমার কানে ॥
শ্যামলিয়া প্রভু ওহে ত্রিভঙ্গ !
পূর্ণ কর ওগো আকাঙ্ক্ষা মোর
বেড়েছে যে রসরঙ্গ এ দেহ ভবনে
শ্যামলিয়া ওগো নন্দ কিশোর
একটা কথা বলি তোমার কানে।